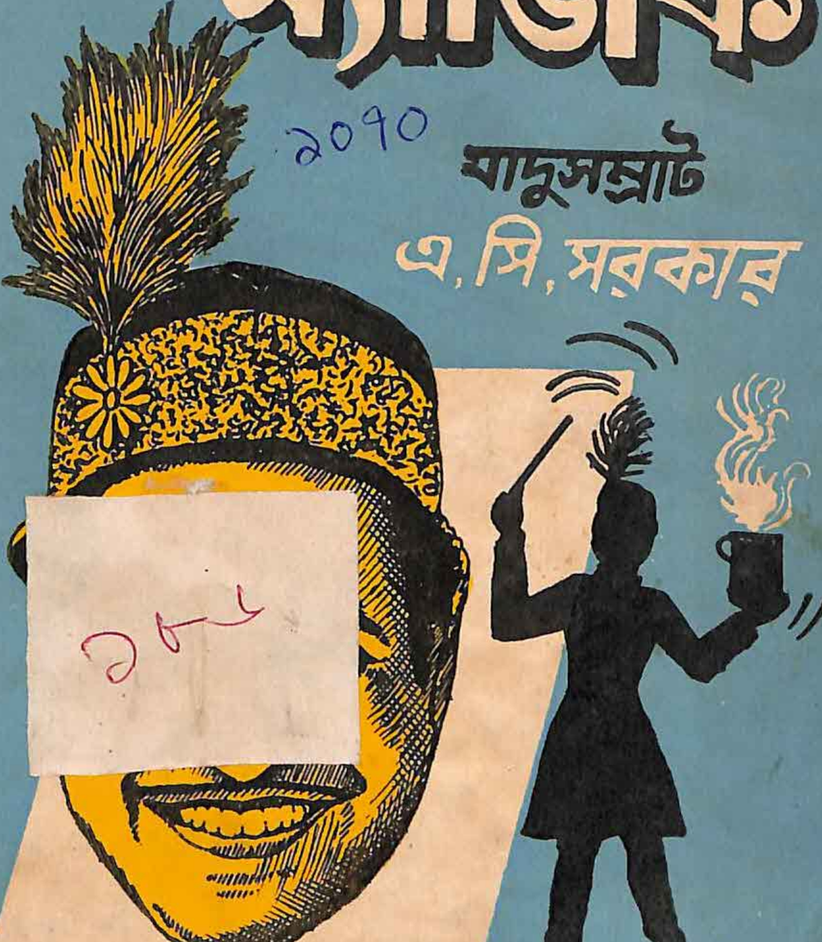
আধুনিক ম্যাজিক

যাদুসম্রাট
এ, সি, সরকার



আধুনিক ম্যাজিক

যাদুসম্রাট

এ. সি. সরকার

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

পিতৃদেব

ও

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৮৮

ADHUNIK MAGIC
By : A. C. SORCER. Magician
26th, January, 1982

মূল্য : ছয় টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
হইতে শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সাধনা প্রেস,
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীঅজিত চৌধুরী
কর্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞানের দৌলতে কত কি সম্ভব হচ্ছে ! কথা উঠলেই আজকাল ভাবি চন্দ্রলোকে যাওয়া স্পূটনিকের কথা, আরও কত কি ! তবে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য যে কতভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা যায় তা এ. সি. সরকার এই বইয়ে লিখেছেন।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এই বই পড়ে যদি আমোদ-প্রমোদের খোরাক এর মধ্যে খুঁজে পায় তা হলে লেখক খুসী হবেন।

আমি বলি লোক দেখে শেখে ও ঠকে শেখে, পড়ে যদি তারা চতুর হয়ে উঠতে পারে মন্দ কি !

॥ সত্যেন বোস ॥

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বহুদিন বাজারে দুষ্প্রাপ্য থাকার পর পাঠক সাধারণের আগ্রহে প্রখ্যাত শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে আমার ও পাঠক-বর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আশা করি প্রথম সংস্করণের মত এই সংস্করণও পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

ম্যাজিক ভিলা
১২।৬, সেলিমপুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৩১
ফোন নং ৪৬-৬১৭৬

এ. সি. সরকার
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮২

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

যাদুসম্রাট এ. সি. সরকার ঐন্দ্রজালিক হিসাবে এদেশে ও বিদেশে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত নূতন-নূতন খেলা দেখে বিশ্বের অসংখ্য দর্শক এবং বহু বিখ্যাত যাদুকর বিস্মিত হয়েছেন। তাঁকে দেশবিদেশের জনসমাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাদুবিদ্যাবিশারদ ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছে সেকথা নতুন করে বলবার দরকার নেই—কিন্তু তিনি যে বিজ্ঞানের ছাত্র একথা হয়তো অনেকের জানা নেই। নিজে তিনি বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, সেইজন্যেই তাঁর অধিকাংশ খেলার পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। বিশ্বজনবরেণ্য বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সৃষ্টির উল্লেখ ক'রে এ. সি. সরকারের অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিতি অথচ মূল্যবান গুণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

॥ লেখকের কথা ॥

ছোটরা ভালবাসে খেলতে। ম্যাজিকের রহস্য বিশেষভাবে দোলা দেয় তাদের কচি মনে। এই কারণেই আমি এই বইটিতে এক সঙ্গে গেঁথেছি এমন কতকগুলি ম্যাজিকের খেলা যা আসলে বিজ্ঞানের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাজিকের মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়েছে বিজ্ঞানের কাঠখোট্টা রূপ। ফলে এগুলো অতি সহজেই দখল করে নিতে পারবে ছোটদের মন। এই খেলাগুলো দেখাতে গিয়ে ছোটরা পরোক্ষভাবে পরিচিত হবে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে। খেলা দেখিয়ে আনন্দ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটরা যদি বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞানও লাভ করে তবে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সাগর পারের দেশগুলোতে দেখেছি কেমন করে ছোটরা খেলার ভেতর দিয়ে জ্ঞান আহরণ করে। জ্ঞান লাভের নানা প্রকারের ব্যবস্থা আছে ওসব দেশে। ছোটদের উপযোগী নানা ধরনের শিক্ষামূলক খেলা শেখার বইও অনেক কিনতে পাওয়া যায়। বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে হাতে-কলমে নানা বিষয় পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থাও যে নেই, তা নয়। আমাদের দেশের ছোটরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

যে সব খেলা এই বইয়ে স্থান লাভ করেছে তার মধ্যে এসিড এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক মশলার ব্যবহার যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যে কয়েকটি খেলাতে এ সব জিনিসের ব্যবহার অপরিহার্য, পাঠকবৃন্দকে সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এই সব রাসায়নিক ম্যাজিক বিশেষভাবে তাঁদের জন্যেই নির্দিষ্ট রইলো যাঁরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই সব মালমশলা বা এসিড ব্যবহার করতে পারবেন। উৎসাহী পাঠকেরা যদি

আমার সঙ্গে পত্রালাপ করেন তবে তাঁদের আমি নানাভাবে সাহায্য করবো বলে কথা দিচ্ছি। রিপ্লাই কার্ডে চিঠি লিখতে হবে।

এই বইয়ের কিছু কিছু খেলা ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধাকারে মাসিক শিশুসাথী ও দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পী সুধীর মৈত্র, বীতপাল ও ধীরেন বল এঁকেছেন ভেতরের ছবিগুলো। এঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁদেরও জানাই ধন্যবাদ যাঁরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমাকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে।

ম্যাজিক ভিলা
১২।৬, সেলিমপুর রোড
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১
ফোন নং ৪৬-৬১৭৬

এ. সি. সরকার
২৫ বৈশাখ ১৩৬৫ সাল

সূচনা

আধুনিক ম্যাজিক !—হ্যাঁ, আধুনিক কালের আধুনিক ম্যাজিকের কথাই এবার শোনাবো। রেডিও-টেলিভিশন, কথা-বলা ছবি, হাউই বিমান আর অ্যাটম বোমার যুগের উপযোগী আধুনিক ম্যাজিক।

এই যুগটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের। ঘরে বাইরে যেখানেই যাও না কেন সেখানেই দেখবে কলকব্জার কেরামতি আর যন্ত্রপাতির ষড়যন্ত্র। আধুনিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে 'কল' ছাড়া সবই হয়ে পড়ে বিকল আর বিফল।

এই কারণেই আধুনিক কালের আধুনিক যাদুকরদের প্রত্যেকটি খেলার মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব। সাগরপারের দেশগুলোতে নামজাদা যাদুকরদের খেলার মধ্যে তো প্রায় চৌদ্দ আনা অংশই থাকে বৈজ্ঞানিক-তথ্য সম্বলিত খেলা। এই খেলাগুলির মূলে বিজ্ঞান থাকলে কি হবে, দর্শকদের আসনে বসে বড় বড় বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়ে যান এই সব খেলা দেখে। কারণ, তাঁরা শুধু দেখতে পান ক্রিয়াটুকু। এই ক্রিয়া ঘটানোর জন্যে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারসাজি করা হয় সে সবই তো থাকে তাঁদের নজরের আড়ালে। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা

তাঁদেরই সৃষ্ট জিনিস দেখে নিজেরাই হয়ে যান বিস্ময়ে হতবাক। তাঁদের বিচারবুদ্ধি খাটিয়েও তাঁরা সমাধান করতে পারেন না যে কেমন করে ঘটে যায় এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা তাঁদেরই চোখের সামনে।

সেবার ইয়োরোপ ভ্রমণকালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শাখা 'সিতে য়ুনোভারসেত্যার'-এ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে আমি দেখিয়েছিলাম আমার কতকগুলো খেলা। উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দ আমার প্রত্যেকটি খেলা দেখেই বিশেষভাবে বিস্মিত হন এবং প্রদর্শনীর শেষে তাঁদের একদল আমার কাছে আসেন এবং নানাভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকেন যে, কেমন করে ঐসব অদ্ভুত অদ্ভুত খেলাগুলো দেখালাম। অনেকে মন্তব্য করলেন যে 'হিপ্‌নোটিজ্‌ম' ছাড়া এ আর কিছুই নয়। সেদিনের ঐ প্রদর্শনীতে 'হিপ্‌নোটিজ্‌ম' সম্বলিত খেলা দু'একটি যে না ছিল তা নয়, তবে বেশীর ভাগই ছিল বিজ্ঞানের প্রভাবযুক্ত খেলা। এই বিজ্ঞানের প্রভাবযুক্ত খেলাগুলির মূল কৌশল বুঝতে না পেরেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকবৃন্দ সেগুলিকে 'হিপ্‌নোটিজ্‌ম'-এর প্রভাবযুক্ত খেলা বলে অভিহিত করেছিলেন।— কেমন মজা বলো তো?

সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে যে সব খেলা আমি দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলাটির নাম হচ্ছে 'মিস্টিরিয়াস স্যাডো' বা আজব ছায়া। সেই খেলাটির কথাই বলছি শোন।

চার পাঁচটি ছোট ছোট খেলা দেখানোর পরে আমি দেখালাম একটি মজাদার হাসির খেলা। এই খেলা দেখে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লেন, সেই অবসরে আমি গ্রীনরুমে গিয়ে পোশাক বদল করে সাদা রঙের বাহারী পোশাকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকদের বললাম, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, কায়ার সঙ্গে ছায়ার যে কি সম্পর্ক, তা আপনারা জানেন সবাই। কায়া না থাকলে ছায়া থাকতে পারে না। কিন্তু একটা কথা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন—ছায়ার সঙ্গে কায়ার দৈহিক সম্পর্কও বর্তমান। এটা আমার নবতম আবিষ্কার। ছায়ার আপনি যে অবস্থাই করুন না কেন, কায়ারও হবে সেই অবস্থা।"

এই কথা বলার পরে আমার এক সহকারী ট্রেতে করে একটা বড় আপেল আর একটা ছুরি নিয়ে প্রবেশ করলো। আমি আপেল আর ছুরিটা দর্শকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে স্টেজে ফিরে এলাম। এর পরে পাতলা কাঁচের টেবিলের উপরে আপেলটাকে রেখে উল্টো দিকে একটা লাইট জ্বেলে দিলাম—আপেলটার ছায়া গিয়ে পড়ল পিছনের পর্দার উপরে। এইবার ছুরিটা নিয়ে যেই মাত্র আপেলের ছায়াতে কোপ দিলাম অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপেলটা দুই টুকরো হয়ে পড়ে গেল। এর পরে একটা সাধারণ মোমবাতি বসিয়ে দিলাম টেবিলের উপরে নেভানো অবস্থায়, ছায়াটা গিয়ে পড়ল পর্দার উপরে। আমি একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতির পল্‌তের ছায়াতে

ছুঁইয়ে দিতেই আসল মোমবাতিটা জ্বলে উঠল শিখা বিস্তার করে। জ্বলন্ত মোমবাতিটার শিখার ছায়া পড়ল পর্দায়—ছায়াতে ফুঁ দিতেই শিখাটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল। এ খেলাটা দেখিয়ে দেশে-বিদেশে খুব প্রশংসা পেয়েছি। এই খেলাটি বৈজ্ঞানিক ম্যাজিকের পর্যায়ভুক্ত হলেও এ দেখানো খুবই কঠিন। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক ও হস্তকৌশলের যুগ্ম প্রভাব।

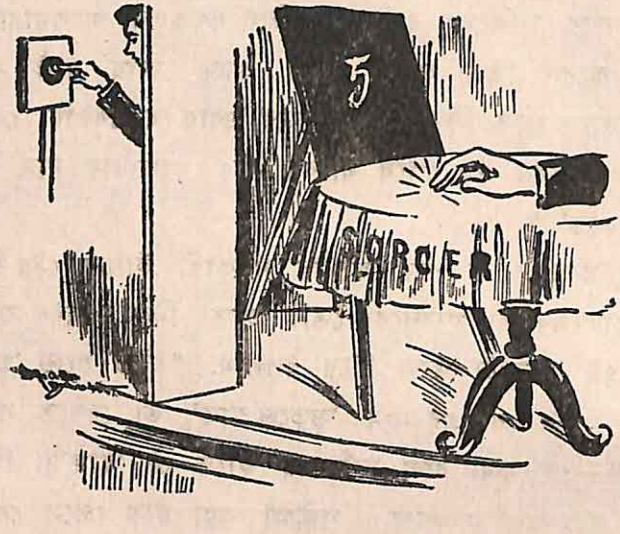
আরও একটি খেলা যা এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানীদের বিমুগ্ধ করে, সেটি হচ্ছে 'ভূতুড়ে হাত'-এর আজব ক্রিয়া-কলাপ।

ভূতুড়ে হাত

এই খেলাটি খুব চমকপ্রদ হলেও এর কৌশল খুবই সহজ। ইচ্ছে করলে তোমরা নিজেরাও দেখাতে পারো এ খেলা। রঙ্গমঞ্চে রয়েছে একটা টেবিল—সাধারণ কাঠের টেবিল। আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকদের বললাম, "প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা ভূতে বিশ্বাস করেন কিনা জানি না। করুন আর না-ই করুন, আমার তাতে ক্ষতি কিছুই নেই—তবে এবার যে খেলাটা দেখাব, সেটা দেখে যেন ভয় পেয়ে যাবেন না। খেলাটার নাম হচ্ছে 'ভূতুড়ে হাত'।"

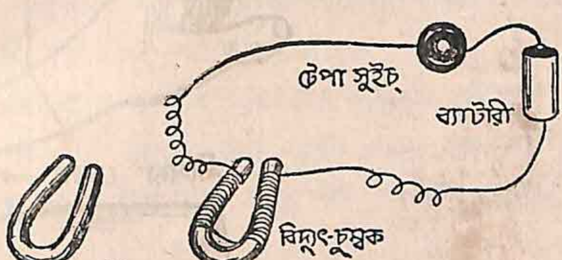
এই কথা বলার পরে আমার সহকারী কাঁচের ট্রের উপরে একটি কাগজের বা প্লাস্টারের তৈরি 'হাত' নিয়ে প্রবেশ করল। আমি এই 'হাত'টা তুলে নিয়ে বললাম, "এইটি হচ্ছে 'ভূতুড়ে হাত'। কেন যে এর নাম 'ভূতুড়ে হাত' তা দেখতে পাবেন এক্ষণি।"—এই কথা বলে দর্শকদের হাতে ঐ 'হাত'টা দিলাম পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। পরীক্ষা করা হয়ে গেলে সেটিকে ফেরত নিয়ে টেবিলের উপরে রাখলাম। আমার নির্দেশমত দর্শকেরা স্টেজে উঠে স্টেজের কোণে রক্ষিত বোর্ডের উপরে একটা একটা করে সংখ্যা লিখতে লাগলেন, 'ভূতুড়ে হাত'টা খট্ খট্ করে টেবিলের উপরে টোকা দিয়ে দিয়ে ঐ সংখ্যা পড়ে দিতে লাগলো। যেমন ধরো লেখা হল পাঁচ—হাতটাও সঙ্গে সঙ্গে পাঁচবার টোকা দিল টেবিলে! দর্শকদের চোখের সামনেই ঘটল এই ব্যাপারটা—কোন সুতো বা অন্য কিছুর সংযোগ নেই—দেখে তো দর্শকেরা অবাক।

এটাও একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক। বিদ্যুৎ-চুম্বকের সাহায্যেই এই খেলাটা দেখানো সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ-চুম্বক তৈরি করার কৌশলটা শোন আগে।



একটা প্রায় ১ ফুট লম্বা ও আধ ইঞ্চি মোটা কাঁচা লোহার রড্ নিয়ে সেটাকে আগুনে পুড়িয়ে 'ইউ' (U)-এর আকারে বেঁকিয়ে নাও—ছবিতে সব বোঝানো আছে। এবারে নাও হাত পঁচিশেক সুতো জড়ানো সরু তামার তার (ডি. সি. সি. ২৮নং)। ঐ লোহার রডের ইউ-র উপরে দুই হাতায় এই তার জড়াও যেমন দেখানো আছে ছবিতে। এক হাতায় ডান-মোচড়ে জড়িয়ে থাকলে অন্য হাতায় জড়াও বাঁ-মোচড়ে। বেশ সমানভাবে জড়াবে এই তার, এলোমেলো করলে কিন্তু হবে না। জড়ানো শেষ হয়ে গেলে

তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারীর সঙ্গে লাগাও। দেখবে ইউ-টা চুম্বকের মতন লোহা আকর্ষণ করেছে—ব্যাটারী খুলে দিলে দেখবে চুম্বক শক্তি চলে গেছে। কাঠের টেবিলের নিচে (ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমন করে) ঐ চুম্বকটা লাগিয়ে নিয়ে, তারের প্রান্ত দুটো নিয়ে যাও গ্রীনরুমে—স্টেজে বিছানো সতরঞ্চির তলা দিয়ে।



সেখানে একটা 'টেপা সুইচে'র (পুশ বটন) ভিতর দিয়ে এই তার যোগ করবে ব্যাটারীর সঙ্গে। এর ফলে টেপা সুইচে চাপ দিলেই ইউ-টা চুম্বক হবে।

হাতটা বানাবে পেপারমেসি বা প্লাস্টার দিয়ে—খুব হাল্‌কা হওয়া চাই। হাতের থাকবে দুটো অংশ—তালু আর মণিবন্ধ। মণিবন্ধের ফাঁপা অংশের সঙ্গে এমন ভাবে তালুর অংশের গোড়ার দিকটা লাগানো থাকবে যে তালুর অংশটা ওঠা-নামা করতে পারবে। মণিবন্ধের অংশটা হবে অপেক্ষাকৃত ভারি। ছবিতে যেমন দেখানো আছে, তেমনি করে তৈরি করতে হবে হাতটি। প্রকৃতপক্ষে তালুর অংশটি থাকবে মণিবন্ধের অংশের সঙ্গে সুতো দিয়ে ঝুলানো—আঙ্গুলের ডগাগুলো থেকে টেবিলের কাঠের দূরত্ব আধ

ইঞ্চির বেশী থাকবে না। আঙ্গুলের ডগায় লোহার পেরেক বসানো থাকবে। গ্রীনরুমে 'টেপা সুইচ' টিপলেই টেবিলের তলাকার



ইউ-টা চুম্বক হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ইউ-এর ঠিক উপরে রক্ষিত হাতের আঙ্গুলে লাগানো পেরেকগুলোতে চুম্বকের

টান পড়ে। টানের চোটে আঙ্গুলের অংশ টেবিলের কাঠে আঘাত করে, আর হয় খট্ খট্ শব্দ। চুম্বকের আকর্ষণে টেবিলের কাঠে আঘাত করে যাতে হাতের তালুর অংশটা আবার আগের অবস্থায় অর্থাৎ টেবিল থেকে আধ ইঞ্চি উপরে উঠে আসে সেজন্যে মণিবন্ধের অংশের ভিতরে অবস্থিত হাতের তালুর অংশে বাকীটুকুর সঙ্গে ছোট সীসার ঢেলা লাগানো থাকবে। ভাল করে ছবি দেখে নাও—সব বুঝতে পারবে।

বোর্ডটা এমন ভাবে রাখতে হবে যেন গ্রীনরুম থেকে সহকারী তা দেখতে পারে। বোর্ডে লেখা সংখ্যা দেখে সহকারী সংখ্যা অনুসারে টেপা সুইচে দেবে চাপ, আর খট্ খট্ আওয়াজও হবে তেমনি।

টাকা অদৃশ্য করা

হাতে আছে একটা চক্চকে রূপোর টাকা। দু-তিনবার সেটাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করলেন যাদুকর, কিন্তু সফল হলেন না। তখন তিনি বাঁ হাতের মুঠোতে টাকাটা রেখে তাতে দিলেন ফুঁ—অবাক কাণ্ড ! টাকা উধাও ! কাণ্ড দেখে তো দর্শকদের মধ্যে পড়ে গেল এক বিস্ময়ের সাড়া। দিন-দুপুরে খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেমন করে এই অদ্ভুত কাণ্ডটি দেখালেন যাদুকর, তার কোন হদিশই কিন্তু পেলেন না দর্শকেরা।

আগ্রা ফোর্টের পাশে একটা ছোট মাঠর মধ্যে দাঁড়িয়ে এক যাদুকরকে দেখাতে দেখলাম এই খেলাটা আর মনে মনে ভাবলাম এই খেলা দেখানোর একটা বিকল্প পদ্ধতি, যাতে করে তোমরাও খুব সহজে তোমাদের বন্ধুমহলে হুলুস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারো।

চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতার কথা তো জানা আছে সকলেরই। চুম্বকের এই অদ্ভুত আকর্ষণ-ক্ষমতার উপরেই এই নূতন খেলাটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সবাই তো জানো চুম্বক নূতন নিকেলের টাকাগুলোকে কেমন সুন্দরভাবে আকর্ষণ করে এবং টেনে ধরে রাখে। অদৃশ্য করার জন্যে তোমরা কিন্তু নিকেলেরই ছোট টাকা একটি নেবে। আগে থেকেই কোটের বাঁ-হাতের আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে একটি ছোট অথচ শক্তিশালী চুম্বক (পরপৃষ্ঠার ছবিতে যেমন দেখানো হ'ল)। খেলা দেখানোর সময়ে একটু ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াবে। প্রথমে দর্শকদের ভাল করে টাকাটা

দেখিয়ে নেবে। দু-তিনবার উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করবে। অবশেষে বাঁ-হাতের তেলোর উপরে টাকাটা রাখবে। আবার ডান হাত দিয়ে টাকাটা বাঁ-হাতের তেলোর উপর থেকে তুলে

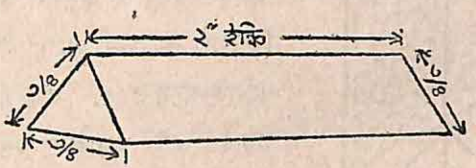


নেবে এবং একটু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাঁ-হাতের কোটের আস্তিনের গায় টাকাটাকে এমনভাবে ছেড়ে দেবে যেন তা চুম্বকের টানে লেগে থাকে। এখন ডান হাতে টাকা না থাকলেও এমন ভান

করবে যেন ডান হাতেই টাকাটা রয়েছে। এইভাবে ডান হাত বাঁ-হাতের তেলোতে ঠেকিয়ে বাঁ-হাত বন্ধ করবে। দর্শকেরা মনে করবেন টাকা বুঝি রাখলে বাঁ-হাতে। এবারে বাজে বাজে সব মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে বাঁ-হাত খোল, দর্শকেরা দেখবে টাকা উধাও। এ-অবস্থায় বাঁ-হাত খুব বেশী নাড়াচাড়া করবে না, তবে কিন্তু টাকা সবার নজরে পড়বে। ভালভাবে অভ্যাস করে তবেই এ খেলা দেখাবে, নইলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।

তাজা মাছ আর মরা মাছের ম্যাজিক

তাজা মাছ আর মরা মাছের ম্যাজিকটাও খুব মজাদার। ফরাসী দেশের বোলন শহরে থাকা কালে এই খেলাটার কথা আমার মাথায় আসে। বোলন হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেলের পারে ফরাসী দেশের এক ছোট্ট বন্দর। মাছ ধরার ব্যবসার জন্য বিখ্যাত এই জায়গা। সমুদ্রের ধারে গেলে শুধু দেখা যাবে ছোট-বড় মাছ ধরার জাহাজ। এখানকার সমুদ্রের জলের গভীরে যেমন থাকে নানা রকমের মাছ,



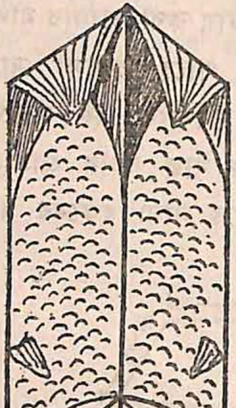
তেমনি জলের উপরেও চিৎ হয়ে অনেক মরা মাছ ভেসে বেড়ায় চিলের পেট ভরাবার জন্য। এই ভেসে ওঠা মরা মাছ দেখেই আলোচ্য খেলাটার কথা আমার মাথায় আসে।

এ খেলাটাতে দেখানো হবে যে, কাঠের মাছও সত্যিকারের মাছের মত গুণ পেতে পারে যাত্নকরের যাত্নকৌশলে। দেবদারু বা অন্য কোনও খুব হাল্কা কাঠ দিয়ে প্রথমে তৈরি করতে হবে ২ ইঞ্চি লম্বা আর ৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থের বাহু-বিশিষ্ট একটি প্রিজম্ (Prism) বা পরকলা (ছবি দেখলে এর আকৃতি বোঝা যাবে)।

এই কাঠের টুক্‌রোটার একটা দিকে লাগিয়ে দেবে সাদা রঙ

আর বাকী দুটো দিকে (ছবিতে যেমন করে দেখানো আছে তেমনি করে রঙ করে) এঁকে নেবে মাছের মতন চেহারা।

কাঠের তৈরি এই অদ্ভুতদর্শন মাছটাকে হাতে নিয়ে দর্শকদের বলবে, "আপনারা তো সবাই জানেন যে, কাঠের মাছের গুণাবলী



কখনও জ্যান্ত মাছের মতন হতে পারে না—কাজেই জলের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ করে জলের মরা মাছকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব না হলেও কাঠের মাছকে ওষুধ প্রয়োগ করে বাঁচিয়ে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়। এ কথাটা অবশ্য আপনারা বিশ্বাস করবেন না। নিতান্ত অসম্ভব বলেই মনে হবে, কিন্তু মোটেই অসম্ভব নয়। এই অসম্ভবকেও আমি সম্ভব করতে পারি—দেখিয়ে দিতে পারি যে, জলে ওষুধ ব্যবহার করে কাঠের মাছকেও বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। তার আগে আপনারা ভাল করে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন এ কাঠের মাছটি অতি সাধারণ। কোনও কারসাজি করা নেই এতে।"

এইবারে দর্শকদের কাছ থেকে কাঠের মাছটি ফেরত নিয়ে একটা পাত্রে রাখা জলের মধ্যে ভাসিয়ে দাও সেটিকে ঠিক ভাবে। কিন্তু যত চেষ্টাই করো না কেন এ মাছকে স্বাভাবিকভাবে উপরদিকে পিঠ রেখে ভাসিয়ে রাখা যাবে না। মরা মাছের মতই চিৎ হয়ে পেট উপরের দিকে রেখে এ ভাসতে থাকবে। এর পরে দর্শকদের

লক্ষ্য করে বলবে, "আপনারা সবাই তো দেখতে পাচ্ছেন কাঠের মাছটা এখন মৃত। মৃত মাছের মতই এ চিৎ হয়ে ভেসে রয়েছে। এইবার দেখুন আমি জলের মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি 'সঞ্জীবনী চূর্ণ'। এই সঞ্জীবনী চূর্ণের গুণে কাঠের মাছ ফিরে পাবে প্রাণ।" এই কথা বলে জল থেকে তুলে নেবে মাছটাকে আর কাঁচের পাত্রে রাখা 'সঞ্জীবনী চূর্ণ' কয়েক চামচ তুলে নিয়ে তা ভাল করে গুলে নেবে জলে। এখন এই জলে কাঠের মাছটাকে আগের মত চিৎ করে ভাসিয়ে দিলে দেখবে, এ আর চিৎ হয়ে থাকছে না— ভাসিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে ভাসছে জ্যান্ত মাছের মত। সঞ্জীবনী চূর্ণের প্রভাবে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখে কি অবাক হবেন না দর্শকেরা?

সত্যি কথা বলতে কি ঐ সঞ্জীবনী চূর্ণের গুণেই এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটে যায়। বলতে পার এই সঞ্জীবনী চূর্ণটি কি জিনিস? এমন কিছু নয়—প্রত্যেকদিন খাবার সময়ে যে নূন আমরা খাই সেই নূন বা লবণই হচ্ছে এই 'সঞ্জীবনী চূর্ণ'। জলের সঙ্গে বেশী পরিমাণে নূন মিশিয়ে দিলে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব যায় বেড়ে। সাধারণ জলের তুলনায় কাঠের মাছটা ছিল ভারী, সেই জন্যে স্বাভাবিকভাবে এ ভাসতে পারেনি পিঠ উপরের দিক রেখে। নূনগোলা জলের গুরুত্ব বেশী হওয়ায় সেই তুলনায় কাঠের মাছ হয়ে ওঠে অনেক হালকা, আর অতি সহজেই তা ভাসতে থাকে। তোমরা তো জান যে, সব সমুদ্রের জলেই আছে লবণ। কিন্তু 'ডেড সী' নামক সমুদ্রের জলে লবণের মাত্রা এত বেশী যে, সে জলে কোন জীবজন্তু ডোবে না—ভেসেই থাকে।

ভুতুড়ে চিনির ঢেলা

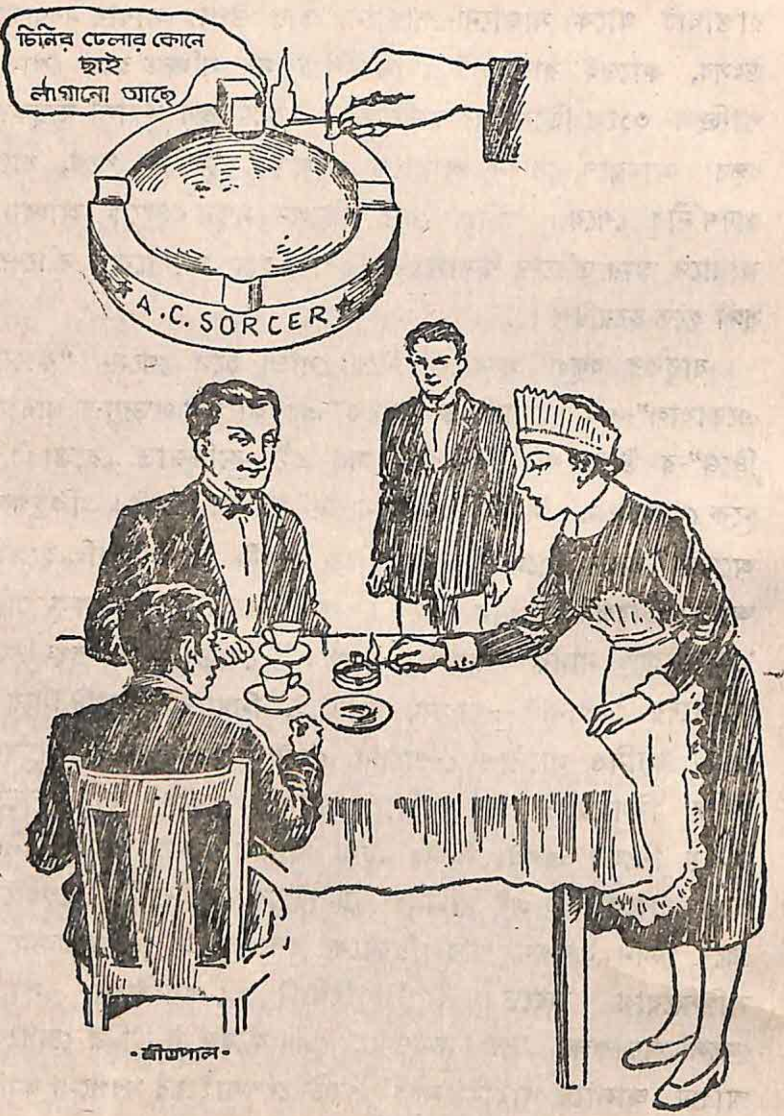
'ভুতুড়ে চিনির ঢেলা' খেলাটা সত্যিই খুব মজাদার। ছোটদের তো কথাই নেই, বড়দেরও অবাক্ করে দেওয়া যাবে এ খেলা দিয়ে অতি সহজেই। 'সুগার কিউব' বা চিনির ঢেলা দেখেছ কি তোমরা? বড় বড় হোটেলে বা রেস্টুরেণ্টে তো এর ছড়াছড়ি। ছক্কার মতন চৌকো আকৃতির ছোট ছোট চিনির ঢেলা—দেখনি কি তোমরা? এ খেলার জন্যে প্রয়োজন হবে এই জাতীয় চিনির ঢেলার। তবে হাঁ, ইচ্ছে করলে কাজ চালানো গোছের ঢেলা তোমরাও তৈরি করে নিতে যে না পারো তেমন নয়। মুঠো খানেক চিনি নিয়ে তাতে ঢালো অল্প একটু জল আর হাতে করে ঢেলা পাকিয়ে নাও। হাতে করে ঢেলা না পাকিয়ে অন্য একটা কাজও করতে পারো। একটা পুরনো দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে তার ট্রেটা (যে অংশে কাঠি থাকে) বের করে নিয়ে সেটাকে ঠেসে ভর্তি করো ঐ জলে ভেজা চিনি দিয়ে। কিছুক্ষণ রৌদ্রে বা উনুনের ধারে রেখে শুকিয়ে নিলেই হল, দেখবে বেশ বড় সাইজের চৌকো চিনির ঢেলা তৈরি হয়ে গেছে একটা।

এই চিনির ঢেলা দিয়েই কেমন করে আমার এক ফরাসী বন্ধু খুব মজাদার একটা যাত্বর খেলা দেখিয়েছিলেন সেই কথাই এখন বলছি।

১৯৫৬ সালের New Year's Day-তে আমি ছিলাম প্যারিস শহরে। জাঁকজমক আর পরিচ্ছন্নতায় প্যারিস শহর যে বিশ্ববিখ্যাত সে কথা তো শুনেছো তোমরা সবাই। এমনিতেই তো সব সময়

রাস্তাঘাট থাকে সাজানো-গোছানো তার উপরে আবার নববর্ষের উৎসব, কাজেই রাস্তাঘাট দোকানপাট সব সজ্জিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রিতেই। কয়েকজন ফরাসী যাদুকর বন্ধুর আমন্ত্রণে সেদিন আমাকে বেরুতে হয়েছিল পথে, যাদু প্রদর্শনীর শেষে। তাঁরা বেরিয়েছিলেন নতুন বছরকে আহ্বান জানাতে আর তাঁদের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে আমাকেও তাঁদের সঙ্গী হতে হয়েছিল।

যাদুকর বন্ধুরা আমাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন "কাফে এতোয়াল"-এ। "আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ"-এর কাছে "এভেন্যু দ্য সানসে দিজে"-র উপরে অবস্থিত প্যারিসের এই অভিজাত রেস্তোরাঁ। ঢুকে দেখলাম সব সিট ভর্তি, কোন টেবিলই খালি নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কোণের দিকে একটা টেবিল খালি হতেই আমরা চারজন বসলাম তাতে। কফি এলো--এলো কেক্ আর 'কোয়াস্ত্যো' নামক ফরাসী পিঠে। খেতে খেতে শুরু হল আমাদের কেরামতি--খাবার, দেশলাই, সিগারেট ইত্যাদি নিয়ে। বন্ধুবর মঁ্যসিও ম্যলোঁও দেখালেন একটা মজার খেলা। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছাইদানিতে নামিয়ে রেখে তিনি হাতে উঠিয়ে নিলেন একটা চিনির ঢেলা আমার সামনে রাখা চিনির পাত্র থেকে। এই চিনির ঢেলাটাকে ছাইদানির একধারে রেখে তিনি একজন পরিচারিকাকে বললেন এই চিনির ঢেলাতে অগ্নিসংযোগ করতে। পরিচারিকাটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও ঐ চিনির ঢেলাতে আগুন জ্বালাতে পারলো না। একটা দেশলাইয়ের সবগুলো কাঠি


চিনির ঢেলার কোনে
ছাই
লাগানো আছে
A.C. SORCER

ফুরিয়ে গেল কিন্তু একটুও জ্বললো না চিনি, কেবলমাত্র একটু কালচে রঙ ধরলো সাদা চিনির ঢেলাটায়।

এর পরে মঁ্যসিও ম্যুলোঁ হাতে তুলে নিলেন চিনির ঢেলাটা। বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লেন—দু'বার ফুঁ দিলেন, তারপর ঢেলাটাকে আবার রাখলেন ছাইদানির এক কোণে। একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি এইবার তিনি ধরলেন চিনির ঢেলাটার গায়ে—জ্বলে উঠলো চিনির ঢেলাটা—ছোট্ট একটা নীলচে শিখা বের করে জ্বলতে থাকলো তা। দেখে তো সবাই হলেন অবাক। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে টেবিলের চারিদিকে জড়ো হয়েছিলেন অনেক লোক। সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে।

বলতে পারো কেমন করে এ সম্ভব হয়েছিলো? মন্ত্রের গুণে? না, মন্ত্র-তন্ত্র নয়। এটাও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। চিনির সঙ্গে 'অ্যালকোহল' জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। এ হচ্ছে দাহ্য জিনিস। আগুন লাগলে এ জ্বলে সত্যি কিন্তু সে দহন ক্রিয়াটা ভাল করে আরম্ভ না করিয়ে দিলে কোনই ফল হয় না। এজন্যে চিনির ঢেলাটার একটা কোণে মঁ্যসিও ম্যুলোঁ একটু সিগারেটের ছাই লাগিয়ে নিয়েছিলেন আর এই কোণেই লাগিয়েছিলেন আগুন। এই ছাই লাগানোর কাজটা তিনি করেছিলেন অতি সাবধানে যাতে কারও নজরে না পড়ে। কাঠ কয়লা জ্বালালে যে সাদা ছাই পড়ে থাকে—সেই ছাই ব্যবহার করে তোমরা অতি সহজে খেলা দেখাতে পারবে। যে পাত্রে চিনির ঢেলাটা বসিয়ে রেখে তোমরা খেলা দেখাবে সেই পাত্রের

তলায় আগে থেকেই রেখে দেবে কিছুটা কাঠকয়লা পোড়া সাদা ছাই। পরে খেলা দেখানোর সময়ে সকলের অগোচরে একটু ছাই তুলে নিয়ে লাগিয়ে দেবে চিনির ঢেলার এক কোণে।

ভালভাবে অভ্যাস করে দেখতো বন্ধুদের অবাক করতে পার কি না এ দিয়ে।

পয়লা এপ্রিলের ম্যাজিক

সে বছর এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ছিলাম জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে। পূব দেশের বিলাত নামে পরিচিত জাপান দেশ—নামেই শুধু নয়, কাজেও তেমনি। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের সব কিছুকেই এঁরা কাজে লাগিয়েছে এঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে। যেমনি এঁদের স্বভাব তেমনি এঁদের জাতীয় চরিত্র—স্বকীয়তার দিক দিয়েও অতুলনীয়। যাক্ সে কথা। সব দিক দিয়েই এঁরা উন্নত—বিজ্ঞানের সাধনায়ও যেমন লিপ্ত এঁরা, তেমনি আর্ট বা ললিতকলার সাধনায়ও এঁদের আগ্রহ অপরিসীম। জাপানে বড় বড় নাচিয়ে গাইয়ে, অভিনেতা ও যাদুকরও তাই রয়েছেন অনেক।

জাপানে যখন ছিলাম তখন অনেক জাপানী যাদুকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। মাঝে মাঝেই তাঁদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনাও করেছি যাদুবিদ্যার বিষয় নিয়ে। এই যাদুকরদের মধ্যে মিঃ তাকাহাসির সঙ্গেই আমার দেখা হত সব চেয়ে বেশী। কারণ আমরা ছিলাম একই পাড়ার বাসিন্দা। তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে মজার মজার জাপানী ম্যাজিক দেখাতেন। এমনি করেই দিন কেটে যেতে লাগলো। অবশেষে এলো পয়লা এপ্রিল। আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। একটা ছোট কাগজের মোড়কের উপরে মিঃ তাকাহাসির নাম লিখে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর বাড়িতে। বিকেলবেলায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি হেসে বললেন, "মিঃ সরকার, বেশ তো এপ্রিল ফুল করেছ হে

আমায়। কাগজের মোড়ক দেখে ভাবলাম হয় তো দরকারী কিছু হবে। মোড়কটা একটু আলগা করতেই ভেতরে ফর্‌-ফর্‌ খর্‌-খর্‌ শব্দ আরম্ভ হল—ভাবলাম হয়তো বা কোন জানোয়ার! তাই ঘাব্‌ড়ে গিয়ে দিলাম তা হাত থেকে মাটিতে ফেলে। কিন্তু মাটিতে পড়তেই বুঝলাম এ কোনও জানোয়ারও নয়—পোকা-মাকড়ও নয়—এ হচ্ছে সরকারের কীর্তি। সত্যিই খুব 'ফুল' বানিয়েছ আজ তুমি আমাকে।"



কেমন করে এই এপ্রিল-ফুলের কাগজের মোড়ক বানিয়েছিলাম সে কথা তোমাদের বলছি এবারে। প্রথমে তারের ক্লিপ (জেম ক্লিপ) যা দিয়ে কাগজ আটকে রাখা হয়, তাই একটা নাও বড় দেখে। এই ক্লিপের প্যাঁচ খুলে ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে তেমনি করে অর্থাৎ অনেকটা ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতন

করে বেঁকিয়ে নাও। এইবারে সংগ্রহ করো ছোট পয়সার মাপের একটা বোতাম আর শক্ত রবারের সরু একটা ফালি। এই রবারের ফালিটা এমন সরু হবে যাতে বোতামের ঘরের ভেতরে স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারে। এই রবারের ফালিটার এক প্রান্ত প্রথমে তারের 'ইউ'-এর এক হাতায় শক্ত করে বেঁধে নিয়ে প্রান্তটাকে বোতামের একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে, তারের ইউ-এর অন্য হাতায় টাইট করে পাক খাইয়ে, বোতামের অন্য একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে চালিয়ে আবার তারের ইউ-এর প্রথম হাতায় এনে প্রথম প্রান্তের সঙ্গে বেশ করে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

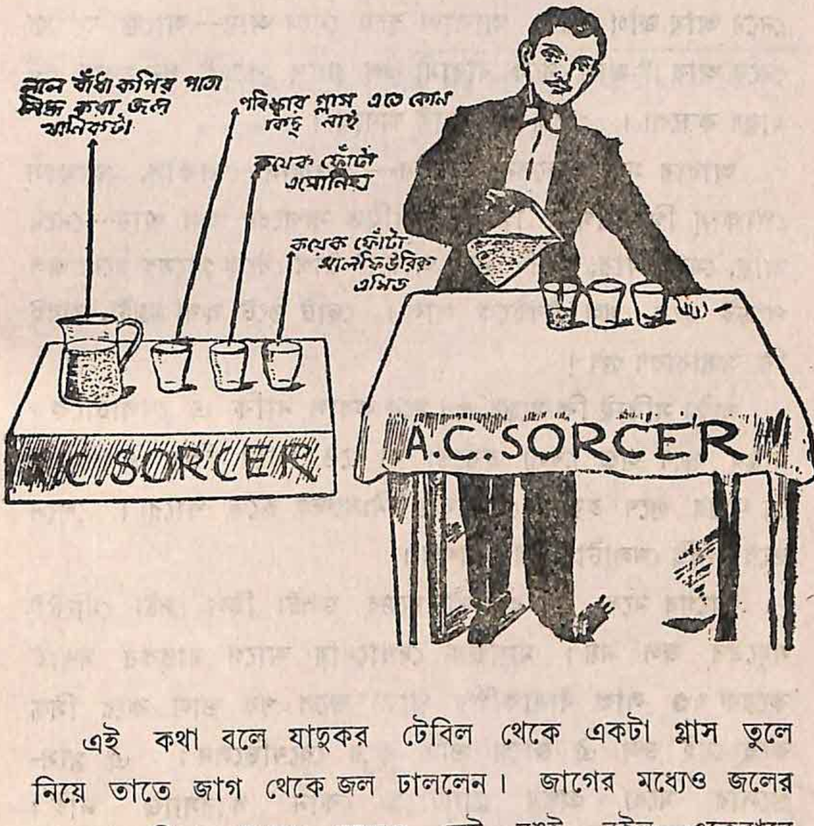
এখন এই বোতামটাকে মোচড় দিয়ে পাক দিলেই রবারটার মধ্যে পাক পড়ে। হাত সরিয়ে নিলেই তাই রবারের পাকের সঙ্গে বোতামও ঘুরতে থাকে। বোতামটাকে খুব করে পাক খাইয়ে চেপে ধরে যদি চারপাশে একটা কাগজ মুড়িয়ে নিয়ে একটা ছোট মোড়ক তৈরি করা যায় তবে মোড়কের কাগজে ঢিলা না পড়া পর্যন্ত রবার পাক খুলতে পারবে না আর বোতামও ঘুরবে না। যেই মাত্র কেউ মোড়কটা খোলার চেষ্টা করবে অমনি ঢিল পেয়ে বোতাম ঘুরতে থাকবে, আর কাগজের গায়ে আঘাত লেগে ফর্ ফর্ খর্-খর্ শব্দ হবে। তৈরি করে দেখো বন্ধুদের জব্দ করতে পারো কি না!

মজার রঙ, না রঙের মজা ?

এ খেলাটা খুব মজার। অল্প কিছুদিন আগে এক আমেরিকান যাত্বকরকে দেখাতে দেখেছিলাম এ খেলাটা। টেবিলের উপরে রয়েছে একটা বড় কাঁচের জাগ আর তিনটে কাঁচের গ্লাস। জাগের মধ্যে আছে ফিকে বাদামী রঙের একটা তরল পদার্থ।

যাত্বকর এসে দর্শকদের লক্ষ্য করে বললেন, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, কিছুদিন পূর্বে আমি যখন যাত্ববিদ্যা দেখানোর উদ্দেশ্যে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম তখন ছুটো সমুদ্রের জল খানিকটা করে সংগ্রহ করে এই জাগে করে আমি নিয়ে আসি। প্রশান্ত মহাসাগর ও লোহিত সাগর। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন লোহিত সাগরের জল একটু লালচে আর প্রশান্ত মহাসাগরের জলের রং সাধারণ সমুদ্রের জলের চেয়ে একটু গাঢ় অর্থাৎ ঘন সবুজ। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার কি জানেন ? জাগের মধ্যে এই ছুই সমুদ্রের জল এক সঙ্গে রাখা মাত্রই এমনি ধারা বাদামী রং হয়ে গেছে তার। কোন ভাবেই আর আলাদা করা সম্ভব হচ্ছে না এই ছুই সমুদ্রের মিশিয়ে যাওয়া জল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারিনি। অবশেষে একদিন মিশরের কায়রো শহরে দেখা হল এক 'ফকির' সাহেবের সঙ্গে। বহু সাধ্যসাধনার পরে তিনি আমাকে শিখিয়ে দিলেন একটা ম্যাজিকের মন্ত্র— "হোকাস্ পোকাস্ গিলি গিলি।" সত্যি সত্যিই এই মন্ত্রটার

গুণ অপরিসীম। মন্ত্রের গুণে এখন অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারি আমি। প্রথম-প্রথম জাগ থেকে যখন জল ঢালতাম তখন জলের রঙ যেমনি বাদামী তেমনি থাকতো, এই দেখুন না।"



এই কথা বলে যাদুকর টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে জাগ থেকে জল ঢাললেন। জাগের মধ্যেও জলের যে রঙ ছিল গ্লাসের মধ্যেও সেই রঙই রইল—একেবারে এক রং।

যাদুকর আবার কথা বলতে লাগলেন, "ভদ্রমণ্ডলী, এইবার দেখুন মন্ত্রের কি অলৌকিক ক্ষমতা।" টেবিল থেকে অন্য একটা গ্লাস তুলে নিয়ে যাদুকর উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়তে লাগলেন—"হোকাস্ পোকাস গিলি গিলি গিলি....প্রশান্ত মহাসাগরের জল আয়, নেমে আয় জাগ থেকে, আলাদা হয়ে নেমে আয়—আস্তে আস্তে নেমে আয়।" জাগ থেকে বাদামী জল গ্লাসে পড়েই ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করলো। দেখে তো সবাই অবাক।

আবার মন্ত্র পড়লেন যাদুকর—"হোকাস্ পোকাস্, হোকাস্ পোকাস্ গিলি গিলি গিলি....লোহিত সাগরের জল আয়....নেমে আয়, নেমে আয়, জলদি নেমে আয়।" জাগ থেকে গ্লাসের মধ্যে জল পড়েই হয়ে গেল টকটকে লাল। ছোট দুটো কথা মন্ত্রটা, তারই কি অসাধারণ গুণ!

সত্যি সত্যিই কি মন্ত্রের গুণ মনে করলে নাকি এ খেলাটাকে? মন্ত্রের গুণে অন্য খেলা হয়তো বা হতে পারে কিন্তু এ খেলাটা যে মন্ত্রের গুণে হয়নি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারো। শোন তবে বলছি খেলাটার মূল কৌশল।

জাগের মধ্যে যে বাদামী রঙের জলটা ছিল সেটা মোটেই সমুদ্রের জল নয়। ম্যাজিক দেখানোর আগে যাদুকর মশাই কয়েক খণ্ড লাল বাঁধাকপির পাতা জলে খুব ভাল করে সিদ্ধ করে সেই জল ঐ জাগে ভর্তি করে রেখেছিলেন। ঐ গ্লাস-গুলোর মধ্যে প্রথম গ্লাসটাতে কোন কারসাজি নাই। খেলা দেখানোর আগে দ্বিতীয় গ্লাসটার মধ্যে কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া, আর তৃতীয় গ্লাসটাতে কয়েক ফোঁটা

সালফিউরিক এসিড* দিয়ে রেখেছিলেন যাদুকর। এই কারণেই প্রথম গ্লাসে যখন যাদুকর কপি পাতা সেদ্ধ জল ঢাললেন তখন কোনই পরিবর্তন হল না রঙের। দ্বিতীয় গ্লাসে এমোনিয়ার সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রঙ হল সবুজ, আর তৃতীয় গ্লাসে রঙ হল লাল।

---

*এই 'সালফিউরিক এসিড' কিন্তু খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। গায়ের চামড়ার সংস্পর্শে এ যেন না আসে, কোনক্রমে মুখেও যেন না যায়—তবে কিন্তু সব জলে পুড়ে যাবে।

এক্স্-রে চক্ষু

মানুষের চোখের দৃষ্টি কি এমন শক্তিসম্পন্ন হতে পারে যে, সব কিছু ভেদ করে চলে যেতে পারে তা? যারা আমার এক্স্-রে চক্ষুর খেলা দেখেছ বা ঐ খেলার কথা কাগজে পড়েছ অথবা লোক-মুখে শুনেছ তারা সবাই বলবে যে এ অসম্ভব নয়। কারণ, প্লাস্টার, তুলো ইত্যাদি লাগিয়ে তার উপরে ব্যাণ্ডেজ ও সর্বোপরি পুরু ক্যানভাসের ব্যাগ বা থলে দিয়ে পুরো মাথাটা ঢেকে দিয়েও আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এইভাবে চোখ বন্ধ করে দেবার পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন-যানবহুল রাজপথে মাইলের পর মাইল মোটর সাইকেল চালিয়েছি আমি। এসব তো খবরের কাগজেই পড়েছ, নতুন করে আর এর কথা বলার দরকার নেই।

'এক্স-রে' (X-Ray) বা রন্‌জেন রশ্মি যেমন নানা জিনিস ভেদ করে যেতে পারে অবাধে, আমার চোখের দৃষ্টিও নাকি তেমনি শক্তিসম্পন্ন। এই কারণে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকবৃন্দ আমাকে 'The man with X-Ray eyes' এই নামে পরিচিত করেছেন। চক্ষু বন্ধ অবস্থায় যানবাহন চালানো ছাড়া দর্শকদের দেওয়া অঙ্ক করে দেওয়া বা বোর্ডের উপরে দর্শকদের লেখা যে কোন ভাষা পড়ে দেওয়া আর তাঁদের আঁকা অসমাপ্ত ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দরও করে দেওয়া তো আছেই চোখ বাঁধা অবস্থাতে। এ ছাড়া কোনও দর্শকের দেহের কোনও বিশেষ অংশে আমার অজ্ঞাতে রেখে দেওয়া

আপেল বা অন্য কোনও ফল তরবারি বা খড়্গ দিয়ে দু'টুকরো করাও অসম্ভব নয়।

এবার আমি যে 'এক্স্-রে চক্ষু'র খেলার কথা বলছি সেটির সঙ্গে কিন্তু আমার বিখ্যাত 'এক্স্-রে চক্ষু'র খেলার কোনই সম্বন্ধ নেই। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এটাকে 'এক্স-রে চক্ষু'র খেলা না বলে বরং 'দিব্য দৃষ্টি'র খেলা বলা যেতে পারে। কারণ এ খেলাতে যাদুকর তার দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে সঠিকভাবে বলে দিতে পারবেন যে খামের মধ্যে কোন্ ধরনের কার্ড আছে। খাম না খুলে কি কেউ বলতে পারে এমন কথা ?—কাজেই সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, যাদুকরের দৃষ্টির সাহায্যেই হোক আর 'এক্স-রে চক্ষু'র প্রচণ্ড পদার্থভেদী দৃষ্টির সাহায্যেই হোক এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে !

খেলাটি মোটামুটি এই রকম।

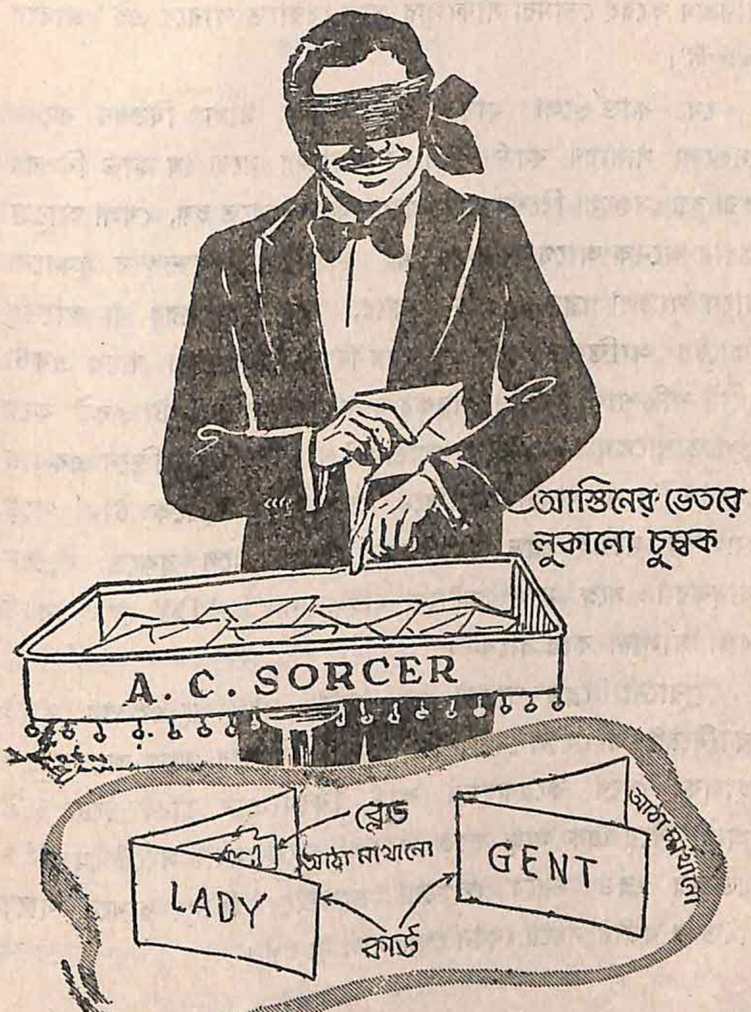
যাদুকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে কতকগুলো সাধারণ সাদা কার্ড হাতে তুলে নিলেন আর দর্শকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই কার্ডগুলো বিতরণ করলেন। রঙ্গমঞ্চের সামনে একটি টেবিলের উপর কতকগুলো পুরু খাম, কিছুটা আঠা আর একটি খালি বাস্কেট রেখে যাদুকর বললেন, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এখন যে খেলাটি আমি আপনাদের দেখাব তার জন্য আপনাদের সাহায্য অপরিহার্য। ভদ্র মহিলাবৃন্দ যে কার্ড পেয়েছেন তাতে দয়া করে মহিলা বা LADY কথাটি লিখে এবং ভদ্র মহোদয়গণ যে কার্ড পেয়েছেন তাতে পুরুষ বা GENT কথাটি লিখে আমার অনুপস্থিতির সময়ে খামে

ভরে আঠা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করে এই বাস্‌কেটের মধ্যে ফেলে দেবেন দয়া করে।”

এই কথা বলে যাত্নকর চলে যান রঙ্গমঞ্চ থেকে। কোন বড় হল-ঘরে ডিনার পার্টি, টি পার্টি বা কোনও মজলিসে যদি যাত্নর খেলা দেখান হয়, তবে তিনি চলে যাবেন অন্য কোনও ঘরে। আর তাঁর চোখ বেঁধে দেওয়া হবে পুরু কাপড়ের ব্যাণ্ডেজে। যাত্নকরের অনুপস্থিতির সময়ে দর্শকবৃন্দ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কার্ডে ‘মহিলা’ ও ‘পুরুষ’ (LADY ও GENT) লিখে খামে ভরে বাস্‌কেটের মধ্যে ফেলে ভাল করে মিশিয়ে দেন। এর পরে যাত্নকরকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং একটা একটা করে খাম তুলে নিয়ে খামগুলোকে ত্নইভাগে ভাগ করে ফেলেন আর ত্নটো ভাগ একজন মহিলা ও একজন ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে খুলে দেখতে বলেন যে, তাঁর গণনা ঠিক হয়েছে কি না।

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তাঁদের হাতে দেওয়া খামগুলোকে খুলে দেখেন যে, যাত্নকর মহিলাটির হাতে যে খামগুলো দিয়েছেন তার মধ্যে সবগুলো কার্ডেই ‘মহিলা’ লেখা। ভদ্রলোকের হাতে দেওয়া খামগুলো খোলার পরে তার ভেতর থেকে ‘পুরুষ’ লেখা কার্ডই শুধু বেরুতে দেখা যায়। সবাই দেখে অবাক হয়ে যান যে, কেমন করে খাম না খুলেই যাত্নকর জানতে পারেন কোন্ খামের মধ্যে ‘মহিলা’ লেখা কার্ডগুলো এবং কোন খামের মধ্যে ‘পুরুষ’ লেখা কার্ডগুলো আছে। দিব্য-দৃষ্টি বা ‘এক্‌স-রে

চক্ষু-সম্পন্ন লোক না হলে কি এমন অলৌকিক কীর্তিকলাপ ঘটানো সম্ভব হয় কারও পক্ষে ?



এবারে শোন কেমন করে সম্ভব হয় এ খেলা। দেখে যত

কঠিনই মনে হোক না কেন, এ খুবই সহজ খেলা। অল্প একটু পরিশ্রম করেই তোমরা সাফল্যের সঙ্গে দেখাতে পারবে এই মজাদার খেলাটি।

যে কার্ডগুলো যাদুকর দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করেন সেগুলো সাধারণ কার্ড নয়। মহিলাদের মধ্যে যে কার্ড বিতরণ করা হয় সেগুলো বিশেষভাবে প্রস্তুত করে রাখতে হয়, খেলা আরম্ভ করার অনেক আগে থেকে। এই কার্ডগুলোর অভ্যন্তরে লুকানো থাকে পাতলা ব্লেড একখানা করে, আর যাদুকরের বাঁ হাতের কোটের আস্তিনের সঙ্গে ভেতরের দিকে আটকানো থাকে একটা ছোট্ট শক্তিশালী চুম্বক। যাদুকর যখন খামগুলো একটা একটা করে তুলতে থাকেন তখন তিনি প্রত্যেকটি খামই তাঁর আস্তিনে একবার ঠেকান। যে খামটা আস্তিনে ঠেকানোতে চুম্বকে টান পড়ে সেইটার মধ্যেই ব্লেড ভরা কার্ড আছে বলে বুঝতে পারেন যাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে মহিলা বা LADY লেখা কার্ড বলে আলাদা করে রাখেন।

পুরানো ব্লেড পাওয়া তো কঠিন নয়। দু-একবার দাড়ি কামিয়েই তো ফেলে দেওয়া হয় ওগুলো। বাজার থেকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা দেখে কয়েকখানা কার্ড কিনে এনে তারই দুটো দুটো আঠা দিয়ে এক সঙ্গে জুড়ে নেবে। জুড়ে নেবার সময়ে যেগুলোর ভেতরে ব্লেড ভরবে সেগুলো ভালভাবে চিনে রাখবে যাতে বিতরণ করার সময়ে কোন গোলমাল না হয়।

বরফের ভেল্কী

'বরফের ভেল্কী' খেলাটা চমৎকারিত্বে অন্যান্য খেলার চেয়ে কোন অংশেই কম নয় যদিও এর কৌশলটা খুবই সহজ। টেবিলের উপরে সামান্য ব্যবধানে রয়েছে দুটো কাঠের টুকরো। যাদুকরের সহকারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন একটা ফুট দেড়েক লম্বা আর প্রায় ৬" × ৬" মোটা বরফের টুকরো হাতে নিয়ে আর রাখলেন কাঠের টুকরোর ওপরে। একটা লোহার সরু মতন তার (যে রকম সরু তার সেতার, এসরাজ ইত্যাদিতে প্রথম তার হিসাবে ব্যবহার হয়) নিয়ে যাদুকর দিলেন দর্শকের হাতে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। এরপর যাদুকর বক্তৃতা দিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে কোন জিনিস না কেটে তার ভেতর দিয়ে কোন কিছু ভেদ করে যেতে পারে না কিন্তু আমি আপনাদের দেখাবো যে সে কথা সত্যি নয়।" এই কথা বলে যাদুকর বরফটার ঠিক মাঝ-বরাবর তারের একটা ফাঁস লাগিয়ে ফাঁসের নিচের দিকে গাঁট দিয়ে সেই গাঁটের সঙ্গে একটা সের দশেক ওজনের আংটাওয়ালা বাটখারা ঝুলিয়ে দেন।

এইবারেই আরম্ভ হয় আজব কাণ্ড। বাটখারার ওজনের ভারে বরফ কেটে তার নামতে থাকে নিচের দিকে এবং অল্প কিছুকাল পরেই পুরোপুরি বরফের খণ্ডটা ভেদ করে তারটি নিচের দিকে নেমে আসে। দর্শকেরা দেখে অবাক হন যে বরফের খণ্ডটার কোনও ক্ষতিই হয়নি এতে। কেটে যাওয়া তো দূরের

কথা—সামান্য একটু দাগও পড়েনি এর ফলে বরফের টুকরোর গায়ে। বরফের ধর্মই হচ্ছে এই। বাটখারার ওজনের টানে তারের চাপ পড়ে বরফের ওপরে আর ওই অংশের বরফ যায় গলে। সেই বরফ গলা জলে তার ডুবে যায় আর নিচের শক্ত বরফের গায়ে দেয় চাপ, সেই চাপে নিচের স্তরও গলে যায় কিন্তু ইত্যবসরে ওপরের বরফ গলা জল আবার জমে বরফ হয়ে যায়। এই কারণেই বরফের টুকরোটি কেটে দু'খানা হয়ে যেতে পারে না কোনমতেই।

অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি

একটা চমকপ্রদ খেলার কথা শোন এবারে। এটা হচ্ছে এমনি একটা খেলা যা দেখিয়েও যেমন আনন্দ পাওয়া যায় আবার যাঁরা দেখেন তাঁরাও পান ঠিক তেমনি আনন্দ। এ খেলার নাম আমি দিয়েছি 'অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি'। এর চেয়ে ভাল নাম এ খেলার আর কি হতে পারে বলো? এমনই চমকপ্রদ খেলা এটি যে, এ দেখে দর্শকেরা যাছুকরকে দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ মনে না করে পারবেন না।

এই খেলাটা সর্বপ্রথম আমি দেখাই হংকং-এ ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে। হংকং থাকা কালে একদিন সেখানকার ডাচ্ কনসালের বাড়ী থেকে আমন্ত্রণ পেলাম, তাদের ওখানে এক পার্টি উপলক্ষে ছোট্ট ছোট কয়েকটা ম্যাজিকের খেলা দেখানোর জন্যে। সত্যি কথা বলতে কি, ছোট খেলার সরঞ্জাম তখন বেশী কিছুই ছিল না আমার কাছে। যা স্টেজ ছাড়াও দেখানো যায় এমনিধারা কতকগুলো খেলার সরঞ্জাম করে নিলাম এক দিনের মধ্যে। ঐ খেলাগুলোর মধ্যে থেকেই একটার কৌশল এখন আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের কাছে।

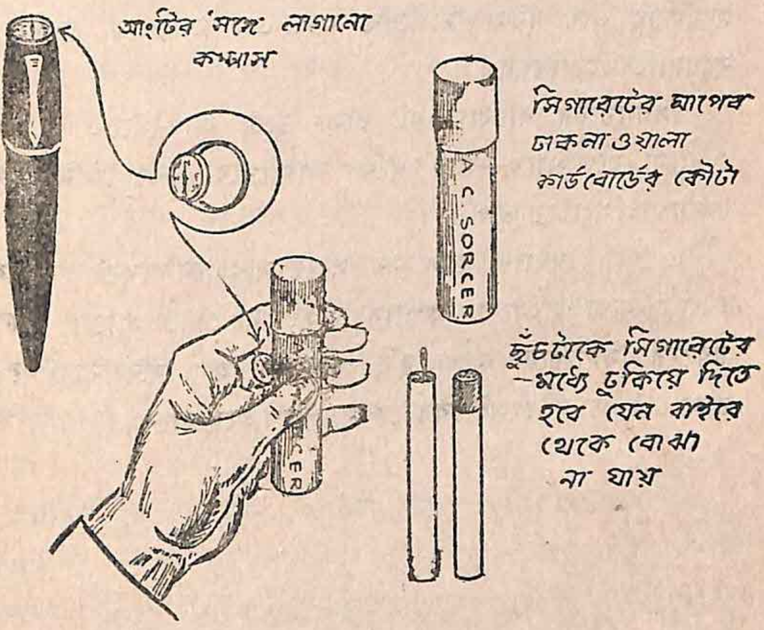
দর্শকদের কাছ থেকে ছু'রকমের ছুটো সিগারেট চেয়ে নেওয়া হল। একটি সাধারণ সিগারেট ও অপরটি গোল্ডটিপ্ ড বা কর্ক-টিপ্ ড। এর পরে কোন এক বিশিষ্ট দর্শকের হাতে দিলাম আমি একটা গোটা সিগারেট ধরতে পারে এমন মাপের কার্ডবোর্ডের তৈরি ঢাকনাওয়ালা কৌটো। দর্শক মহোদয় ভালভাবে পরীক্ষা করে

দেখলেন যে কৌটোটাতে কোন কারসাজি করা নেই বা কোনও ফুটো নেই তার গায়ে। কৌটোটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেলে উক্ত দর্শকমহোদয়ের হাতে সিগারেট ছুটো দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। আমার অনুপস্থিতিকালে ঐ সিগারেট ছুটোর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিয়ে ঐ কার্ডবোর্ডের কৌটোর মধ্যে ভরে নিয়ে কৌটোর মুখে খুব শক্ত করে ঢাকনা এঁটে দেওয়া হল আর অন্য সিগারেটটাকেও সরিয়ে ফেলা হল। তখন আমি ঘরে ঢুকে কৌটোটাকে কপালে ঠেকিয়ে তৎক্ষণাৎ বলে দিলাম কোন্ রকমের সিগারেট রাখা আছে কৌটোর মধ্যে। এইভাবে ছু'তিনবার করে দেখান হল। দর্শকেরা যে দেখে কত অবাক হয়েছিলেন এ খেলা দেখে—তা বলে বোঝানো যাবে না।

এ খেলার কৌশলটা শিখিয়ে দিলে তোমরাও এ দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পারবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এর জন্যে সবচেয়ে বেশী যে জিনিসের দরকার তা হচ্ছে একটি ছোট 'কম্পাস' বা দিক্‌দর্শন যন্ত্র। এক রকমের জাপানী ফাউনণ্টেন পেনের মাথায় ছোট্ট ছোট্ট এক ধরনের 'কম্পাস' লাগানো থাকে দেখেছ? ঐ জাতীয় ছোট্ট 'কম্পাস' একটা যোগাড় করে নিয়ে তার সঙ্গে আমি লাগিয়ে নিয়েছিলাম একটা আংটি বাঁ হাতের মাঝখানের আঙুলের মাপে। এই আংটি বাঁ-হাতের মাঝখানের আঙুলে এমনভাবে আমি পরে নিয়েছিলাম যাতে এই কম্পাস থাকে হাতের ভেতরের পিঠে, আর বাইরে থেকে এর অবস্থিতির

কথা বোঝা না যায়। একটা সরু ছুঁচও ছিল আমার সঙ্গে। যখন দু'রকমের দুটো সিগারেট আমার হাতে আসে তখন সকলের অলক্ষ্যে একটা সিগারেটের মধ্যে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ঐ ছুঁচটাকে। খেলা দেখানোর সময়ে বাঁ-হাতে কৌটোটা ধরে কপালে ঠেকানোর সময়ে কম্পাসটার দিকে একটু নজর দিতেই



বোঝা গিয়েছিল কোন্ সিগারেট আছে কৌটাতে—ছুঁচওয়ালা, না ছুঁচ ছাড়া। ছুঁচওয়ালা হলে কম্পাসের তো কাঁটা বেঁকে যাবে। ছুঁচ ছাড়া সিগারেট ভরে দিলে কম্পাসের কাঁটার কিন্তু কোনই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞান পড়েছ তারা

নিশ্চয়ই জানো যে চুম্বক লোহাকে টানে আবার লোহাও টানে চুম্বককে। কম্পাসের কাঁটা হচ্ছে চুম্বক, কাজেই লোহার সংসর্গে এলে এতে জাগে আলোড়ন। খালি কৌটোর বেলায় কিন্তু কম্পাসের কাঁটার কোন পরিবর্তন হবে না। কাজেই কৌটো হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করতে হবে যে আদৌ সিগারেট রাখা হয়েছে কিনা কৌটোতে। আমাকে ঠকানোর জন্যে কিন্তু মিঃ ডিকি বলে এক ভদ্রলোক সেদিন ঐ কারসাজি করেছিলেন।

সিগারেটের পরিবর্তে দুই রঙের দুটো বল নিয়েও এ খেলা দেখানো যেতে পারে—তবে দর্শকের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস দিয়ে দেখানোই সবচেয়ে ভাল।

এ খেলা দেখাতে হলে সব সময়ে সাবধানে থাকতে হবে যেন হাতের মধ্যে লুকানো 'কম্পাস' কেউ না দেখতে পায়। কোন্ রকমের সিগারেটের মধ্যে ছুঁচ ঢোকানো হল সেটা কিন্তু খেয়াল রাখা চাই, তা না হলেই কিন্তু খেলা খারাপ হয়ে যাবে।

জাপানী ভেল্কী

জাপানে অবস্থানকালে একটা মজার ম্যাজিক দেখেছিলাম। ম্যাজিকটা এমন কঠিন কিছুই নয়, কিন্তু দেখলে অবাক হতে হয় খুবই। বৈজ্ঞানিক তথ্যের কারিগরীতেই এ খেলাটার মূল কৌশল—এই খেলার মূল তথ্য প্রাকৃতিক খেয়ালের মধ্যেও রয়েছে লুকিয়ে। নানা-পত্রপত্রিকার পাতায় "আকাশ থেকে মাছ বৃষ্টির" খবর পড়েছ তো?—এই ম্যাজিকটার মধ্যে সেই মাছ বৃষ্টির রহস্যেরও সূত্র খুঁজে পেতে পারো।

টোকিও শহরের গিঞ্জা স্ট্রীট অঞ্চলে বেড়াতে বেড়াতে একদিন বিকালে দেখতে পেলাম ফুটপাতের এক কোণে ছোট্ট একটা জটলা জমেছে। এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলাম, যাত্নর খেলা হচ্ছে সেখানে। টোকিও শহরে আর তার আশেপাশে এ ধরনের যাত্নর খেলা খুবই হয়। ভবঘুরে যাত্নকরেরা সস্তাদরের ম্যাজিকের খেলনা, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রি করে এমনি ভাবে।

ভিড়ের মধ্যে একটু জায়গা করে নিলাম নিজের জন্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাত্নকর তার "তেজিনা" বা যাত্নর খেলা আরম্ভ করলেন। একটা প্লেটের মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে কেরোসিন-মাখা এক টুকরো কাগজ ছেড়ে দিলেন তার মধ্যে। এর পরে ঐ কাগজের টুকরোতে আগুন লাগিয়ে একটা এলুমিনিয়ামের গ্লাস দিয়ে চাপা দিলেন ঐ আগুন। ফুস্ মন্তরে প্লেটের সব জল হয়ে গেল অদৃশ্য। দেখে তো সবাই অবাক্।

এর পরে তিনি দেখালেন আর একটি খেলা। খেলাটার নাম 'জাপানী ইউবোট'। পেস্টবোর্ড থেকে ইউবোটের আকারে একটা টুকরো কেটে নিয়ে তিনি এক প্লেট জলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে দর্শকদের বললেন—"আপনারা কি হাত দিয়ে স্পর্শ না করে বা ফুঁ না দিয়ে, এই বোটটাকে চালাতে পারবেন?" সবাই জানাল অক্ষমতা। এবার যাদুকর একটা ড্রপারে করে খানিকটা কেরোসিন



তেল নিয়ে বোটের পেছন দিকের কাটা জায়গাতে ফেলতেই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল কাগজের ইউবোট। ভূতুড়ে কাণ্ড আর কি!

এবারে শোন ম্যাজিক দুটোর কৌশল। প্রথমে জাপানী ইউবোটের কৌশলটাই শোন। প্রথমে একটা পোস্টকার্ড বা ঐ

জাতীয় মোটা কাগজ কেটে ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমনি ভাবে তু'ইঞ্চি লম্বা একটা ইউবোট তৈরি করে ফেল—এ দেখতে অনেকটা দেখাবে মাছের মতন। এই ইউবোটের পেটের কাছে একটা ফুটো করে লেজের দিক পর্যন্ত একটা ফালির মতন করে কেটে ফেলতে হবে। ছবিতে পরিষ্কার করে সব কিছু বুঝিয়ে দিলাম।

এবারে শোন জল অদৃশ্য করার খেলার মূল তথ্য। এ তথ্য বোঝাতে হলে একটু বিজ্ঞানের কচ্‌কচির প্রয়োজন। আশা করি তোমরা ধৈর্য ধরে শুনবে। পৃথিবীর উপরে আছে বায়ুমণ্ডল—পৃথিবীপৃষ্ঠের সব কিছুর উপরেই আছে বায়ুর চাপ। এই চাপের পরিমাণ কতটুকু জানো? এক ইঞ্চি লম্বা আর এক ইঞ্চি চওড়া যায়গায় সাড়ে সাত সের করে বায়ুর চাপ পড়ে। এই চাপটা কিন্তু বায়ুস্তরের ওজন। সব দিক থেকেই বায়ু এই চাপ দিচ্ছে প্রত্যেকটি জিনিসের উপরে। তাপ পেলে বায়ু হাল্‌কা হয়ে যায়, আর তার ফলে চাপও যায় কমে। তখন চাপের সমতা রাখার জন্যে চারপাশ থেকে হাওয়া ছুটে যায় যেখানে চাপ কমে যায় সেখানে। গ্লাসের ভেতরে যে হাওয়া ছিল, আগুনের তাপে তা হাল্‌কা হয়ে গেল। তখন বাইরের হাওয়া দিল চাপ প্লেটের জলের উপরে, আর জলও তাই চাপের চোটে হু হু করে ঢুকে পড়ল গ্লাসের মধ্যে।

মাছ-বৃষ্টির সঙ্গে এর সম্পর্কটা কী তাই শোন এবার। বড় রকমের ঘূর্ণি হাওয়ার মাঝখানে থাকে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুড়ঙ্গ, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকে না কোন বায়ু। এই

কারণেই নদী বা বড় জলাশয় ইত্যাদির উপর দিয়ে এই ঘূর্ণিবায়ু চলার পথে জন্ম নেয় জলস্তম্ভ, অর্থাৎ এই সুড়ঙ্গ পথের ভেতর দিয়ে জল উঠে যেতে থাকে মেঘের রাজ্যে আর সেই সঙ্গে জলচর ছোট ছোট জীব—মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদিও মেঘ রাজ্যে পাড়ি জমায়। এই মেঘ তখন ভেসে যেতে যেতে যেখানে বৃষ্টি ঘটায় সেইখানেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে জলচর জীবেরা। আর আমরা দেখে হই বিস্ময়ে হতবাক্। মনে হয় যেন এ-ও এক আজব ম্যাজিক।

ভূতুড়ে বাল্‌ব্‌

ভূতুড়ে বাল্ব খেলাটি আমি আবিষ্কার করি বেশ কয়েক বছর আগে যখন আমি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলাম সেই সময়ে।

টেস্‌লা (Tesla) কয়েল বা টেস্‌লা ট্রান্‌সফরমার নামের এক রকম যন্ত্র আছে যা দিয়ে করা যায় অনেক আজব কাজ। পর্দার আড়ালে এই যন্ত্র রেখে দিয়ে পর্দার সামনে এই যন্ত্রের কাছাকাছি কোন জায়গাতে যদি একটা ভ্যাকুয়াম টিউব ল্যাম্প বা ফ্লোরেস্কেণ্ট ল্যাম্প ধরো তা'হলে আপনা থেকেই তা জ্বলতে থাকবে তোমর হাতের মধ্যে। দর্শকদের হাতে দিলে তা জ্বলতে থাকবে এমনিধারা। বিদ্যুৎ সংযোগের কোন দরকার হবে না। সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে যদি টেস্‌লা কয়েল যন্ত্রটাকে চালু করবার বা বন্ধ করবার ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারা যায় তবে তো হয় এক আজব ম্যাজিকের খেলা। যাদুকরের মন্ত্রপূতঃ (?) ফ্লোরেস্কেণ্ট ল্যাম্প কোন বিদ্যুৎ সংযোগ ছাড়াই তার হাতে জ্বলে অথচ দর্শকদের হাতে গেলে জ্বলে না। কিন্তু যাদুকর আদেশ করা মাত্র দর্শকের হাতেও তা জ্বলতে থাকে। এমনিধারা আজব কাণ্ড দেখলে কে না অবাক হবে বল তো?

এই খেলাটা অনেক জায়গায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে আমি দেখিয়েছি। দেখিয়ে প্রশংসাও পেয়েছি খুব। এ খেলাটা খুব ব্যয়সাধ্য, কাজেই তোমাদের পক্ষে দেখানো কঠিন হবে। যাতে অল্প খরচে এই জাতীয় একটি খেলা তোমরা তৈরি করে নিতে পারো

সেই জন্যে নতুন উপায় আমি আবিষ্কার করেছি। সেইটার কথাই বলছি এখন। খেলাটার নাম 'ভূতুড়ে বাল্ব'।

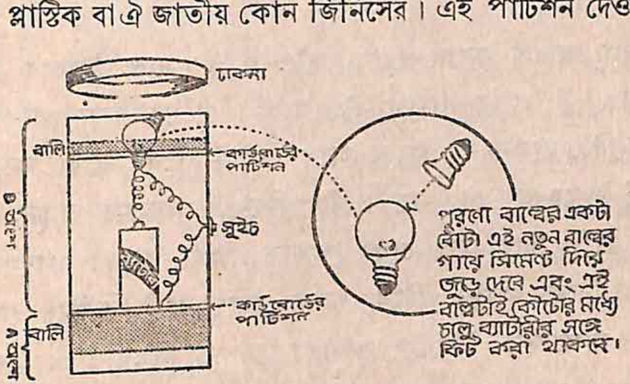
যাদুকরের হাতে আছে একটি সাধারণ 'টর্চের বাল্ব'। দর্শকের সামনে সেইটি দেখিয়ে যাদুকর বলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা সবাই জানেন টর্চের বাল্বে ব্যাটারী সংযোগ না হলে তা জ্বলতে পারে না এবং বাল্বের এই ধাতুনির্মিত অংশ বা বোঁটার সঙ্গেই করতে হয় ব্যাটারীর সংযোগ। অন্য কোন অংশে সংযোগ করলে বাল্ব জ্বলতে পারে না। কিন্তু আমার এই বাল্বটা হচ্ছে অন্য ধরনের। এটাকে আপনারা ভূতুড়ে বাল্ব নাম দিতে পারেন। এই দেখুন এক কৌটো বালি। এই মন্ত্রপূতঃ (?) বালির মধ্যে বাল্বটাকে উল্টো করে বসিয়ে রেখে আমি মন্ত্র পড়লেই জ্বলে উঠবে বাল্বটা।" এই কথা বলে যাদুকর ছ' ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি লম্বা এবং তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি রঙচঙে টিনের ঢাক্‌নাওয়ালা কৌটো নিয়ে কৌটোর ভেতরে বালির মধ্যে বাল্বটাকে উল্টো করে বসিয়ে দেন আর ঢাকনা এঁটে দিয়ে মন্ত্র (?) পড়তে থাকেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরে ঢাকনা খুলতেই দেখা যায় বাল্বটা সেই উল্টো অবস্থাতে কোন বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই জ্বলছে। এইবার যাদুকর ইচ্ছা হলে এই কৌটো হাতে করে নিয়ে সবাইকে কাছে থেকে দেখাতে পারেন ব্যাপারটা। তবে হ্যাঁ, কারো হাতে দেওয়া চলবে না বা কাউকে হাতে দিয়ে পরীক্ষা করতে দেওয়া যাবে না—তা হলে মন্ত্রের গুণ (?) নষ্ট হয়ে যাবে।

যাদুকরকে সবসময়েই এই বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। কারণ দর্শকদের হাতে কৌটো পড়লে খেলার মূল

কৌশল ফাঁস হয়ে যেতে বেশী দেরী হবে না। কাজেই খুব হুঁশিয়ার।

এখন শোন খেলাটার মূল কৌশলের কথা। আসলে বাল্বটার মধ্যে কোনই কারসাজি নেই। যত কারসাজি হচ্ছে ঐ কৌটোর ভেতরে। ঐ কৌটোটার মধ্যে আছে দুটো ভাগ, ছবিতে যেমন দেখানো আছে। কৌটোটাকে বারো আনা চার আনা অংশে ভাগ করে নিয়ে লাগাতে হবে একটা পার্টিশন। এই পার্টিশন হবে কার্ড-বোর্ড, প্লাস্টিক বা ঐ জাতীয় কোন জিনিসের। এই পার্টিশন দেওয়াতে



কৌটোটার হয় দুই অংশ A আর B। এই দুই অংশেরই খোলা মুখ বন্ধ করার জন্য থাকবে পাতলা কানাওয়ালা ঢাকনা, যাতে ঐ-গুলোকে ঢাকনা বলে বোঝা না যায়। A অংশ ঠাসা থাকবে বালিতে। B অংশে থাকবে একটি বা দুটি চালু ব্যাটারী আর তার সঙ্গে লাগানো বাল্ব একটা। ব্যাটারী ও বাল্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইচ্ছে করলে একটা ছোট্ট সুইচও লাগিয়ে নিতে

পারো B অংশের গায়ে। এই সুইচকে সর্বদা রাখতে হবে দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে। B অংশে উপরের দিকে অন্য একটা কার্ডবোর্ডের পার্টিশন লাগিয়ে তার মাঝখানের ফুটো দিয়ে বাল্বটাকে বের করে রেখে বাল্বের অর্ধেক অংশ বালি দিয়ে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা পুরনো বাল্বের ধাতব অংশ খুলে নিয়ে এই বাল্বের উপর দিকে সিমেণ্ট বা Duro fix দিয়ে সাবধানে আটকে দেবে। তাহলেই যন্ত্র তৈরি হ'ল। কৌটোর বাইরে রঙ লাগাতে ভুলো না যেন।

খেলা আরম্ভ করার সময়ে কৌটোর A অংশ উপরের দিকে থাকবে। দর্শকদের সামনে A অংশের বালির মধ্যে বাল্বটাকে বসিয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করবে আর কৌটোটাকে উল্টো করে B অংশটি উপরে আনবে। সুইচ টিপে দিয়ে B অংশের ঢাক্না খুলে দেখবে বালি দিয়ে ঠিক ঢাকা পড়েছে কিনা বাল্বের কারসাজি। না হলে নিজের আঙ্গুল দিয়ে সমান ভাবে বালি ছড়িয়ে দেবে। আমার সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালে নানা জায়গায় এ খেলাটা আমি দেখিয়েছি ছোটদের মজলিসে। লণ্ডনের এক কিশোর কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে যে যাদু প্রদর্শনী আমি পরিবেশন করি তাতেও প্রোগ্রামে ছিল এই খেলাটি। ভালভাবে অভ্যাস করে যদি এ খেলা দেখাতে পারো তবে খুব প্রশংসা পাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একটি মজাদার ম্যাজিক

ম্যাজিক সুতোর ব্যাপার বলি শোন এবার। অতি সাধারণ সুতো হাতে নিয়ে দেখলেও অন্য সুতো থেকে কোন পার্থক্য বোঝা সম্ভব হয় না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর কেরামতি দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। হয় তো বলবে কী এমন কেরামতি?—শোন তবে খেলাটার কথা।

যাত্নকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে হাতে তুলে নেন একটা সুতোর কাটিম। অতি সাধারণ সুতো জড়ানো আছে এতে। ইচ্ছে করলে দর্শকেরা হাতে নিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এ সুতো।

এর পরেই আরম্ভ হয় যাত্নকরের বাক্‌চাতুর্য—"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমার হাতে এই যে সুতো দেখছেন এ হচ্ছে মন্ত্রঃপূত সুতো। অনেক অলৌকিক কাণ্ডই ঘটানো যায় এই সুতোর দৌলতে। এক্ষুণি আমি দেখাচ্ছি এই সুতোর এক বিশেষ কেরামতি।"

এই কথা বলে যাত্নকর ঐ সুতোর কাটিম থেকে ছিঁড়ে নেন ফুট ত্নয়েক লম্বা একটা টুক্‌রো। একজন দর্শকের কাছ থেকে একটা হাল্‌কা আংটি চেয়ে নিয়ে এই সুতোর টুকরোটার এক প্রান্তে বেঁধে নিয়ে সুতোর টুকরোর অন্য প্রান্ত একটা বিশেষভাবে তৈরি স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দেন যাত্নকর। এর ফলে সুতোর সঙ্গে আংটিটা ঝুলতে থাকে। এইবার যাত্নকর মন্ত্র পড়েন "হিং টিং ছট্" আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করেন সুতোতে। দপ্ করে জ্বলে ওঠে সুতো—আস্তে আস্তে জ্বলে তা ছাই হয়ে যায়। কিন্তু

অবাক কাণ্ড! সুতো পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও আংটি পড়ে না! ছাইয়ের সঙ্গেই ঝুলতে থাকে ঐ আংটি!

কেমন করে সম্ভব হয় এই অদ্ভুত ব্যাপার বলতে পারো? শোন তবে বলে দিচ্ছি কারসাজিটা। সুতোটা দেখতে সাধারণ মনে হলেও আসলে ঐ সুতোর মধ্যেই আছে সব কৌশল। ঐ সুতো খেলা দেখানোর আগেই তৈরী করে রাখতে হয়, ৪।৫ বার নূন-জলে ডুবিয়ে আর শুকিয়ে নিয়ে। কেমন করে জানো? নূন-জল তৈরী করে নিয়ে তাতে সুতোটাকে ডুবিয়ে শুকিয়ে নাও। ভাল করে শুকিয়ে গেলে আবার তা ডোবাও নূন-জলে, এমনিভাবে ৪।৫ বার ডুবিয়ে আর শুকিয়ে নিলেই হবে। বর্ষাকালে নূন গলে যে জল হয় সেই জলে সুতো ভিজিয়ে নিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়।

ম্যাজিক কফি

খুব মজার একটা ম্যাজিক—দেখেও যেমন মজা পাবে, দেখিয়েও মজা পাবে তেমনি। ফুস্ মন্তরে ঘটে যাওয়া আজব ব্যাপারের মতনই চমকপ্রদ এই খেলা। কিছুদিন আগে যখন আমি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় মগ্ন ছিলাম, তখনই এই আজব খেলাটার কথা মাথায় এসেছিল। তারপরে এই খেলাটাকে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগাই বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে সিঙ্গাপুরে 'র‍্যাফেল হোটেল' নামক হোটেলে থাকা কালে এই সময়ে অনেক ইউরোপীয়ের সঙ্গেই বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল, তবে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে যাঁদের পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে ডক্টর বোরেট-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে বিদেশে অবস্থানকালে ডক্টর বোরেট নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে সত্যিসত্যিই বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুব আমুদে লোক। হাসি-ঠাট্টা খুব পছন্দ করতেন। মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে নানা তামাশা করতাম আমি। এতে তিনি আনন্দ পেতেন। ডক্টর বোরেটকে কেমন করে একদিন বোকা বানিয়েছিলাম সেই কথাই বলছি এখন।

সেটা ছিল এক রবিবার—আমাদের দেশেও যেমন, অন্যান্য দেশেও তেমনি রবিবার হচ্ছে ছুটির দিন। এমনি এক রবিবারে ডক্টর বোরেটকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমার কামরায়। তখনও সন্ধ্যে হয় নি পুরোপুরি। সাহেব এলেন আমার ঘরে। এমনি ধারা আরও অনেকবার তাঁকে ডেকে এনেছি, আর প্রত্যেকবারই

তাঁকে দেখিয়েছি হু'একটা নতুন নতুন ম্যাজিকের খেলা। আমার আবিষ্কৃত নতুন নতুন খেলাগুলোর অনেকগুলিরই প্রথম দর্শক বলা চলে তাঁকে। ঘরে এসেই তাই ডক্টর বোরেট বলে উঠলেন, 'সরকার, আজকে আবার কি নতুন খেলা দেখানোর জন্যে ডেকে আনলে?'

আমি বললাম, 'বন্ধু, আজ আর খেলা নয়, এমনি একটু গল্প-গুজব করব, আর গরম কফি পান করব হু'জনে মিলে। আপত্তি নেই তো?'

সাহেব সম্মতি জানালেন ঘাড় নেড়ে। যথাসময়ে বেয়ারা এল, ট্রের ওপরে হুই গ্লাস কফি আর হুই পাত্র চিনি নিয়ে। আমি একটি গ্লাস আর চিনির পাত্র উঠিয়ে নিয়ে, অন্য গ্লাস আর চিনির পাত্র সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'কফিতে চিনি মেশানো নেই, নিজের হাতে মিশিয়ে নিতে আজ্ঞা হয়।' সাহেব তো চামচেতে করে চিনি তুলে কফিতে ঢেলে, দিলেন নাড়া। নাড়া দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই চম্‌কে উঠলেন তিনি। সব কফি যে জল হয়ে গেল! সাহেব তো ব্যাপার দেখে অবাক—'সরকার, এই নাকি তোমর কফি খেতে খেতে গল্প করা? খুব ভাল ম্যাজিক তৈরি করেছ তো হে!'—সাহেবের আর কফি খাওয়া হল না। উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরিলেন তিনি আনন্দের চোটে। ঠকেও তিনি পেয়েছিলেন সীমাহীন আনন্দ।

খেলাটার মূল কৌশল কী তা বলছি এবার, শোন মন দিয়ে। হুটো রাসায়নিক মশলার দৌলতেই সম্ভব হয়েছিল এই খেলা।

এই জাতীয় খেলাগুলো বিজ্ঞানের সাহায্য না নিয়ে করা আদৌ সম্ভব হয় না। কেবল এই জাতীয় ম্যাজিকই নয়, বর্তমানকালে যে সমস্ত বড় বড় খেলা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, তাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক। বিদ্যুৎ আর বেতারকে কাজে খাটিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যে সব লোমহর্ষক খেলা জন্ম নেবে, তার পূর্বাভাস এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। যে যত বেশী করে বিজ্ঞানের তথ্যকে ম্যাজিকের খেলার মধ্যে মেশাতে পারবে, তার খেলাই হবে তত আধুনিক। বিজ্ঞানের এক অত্যাধুনিক সূত্রকে কাজে খাটিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি একটি নূতন খেলা—'ডি-মেটেরিয়ালিজেশন'। কোন রকমে একটি লোক দাঁড়াতে পারে এমনি একটা সামনে ও পেছনে কাঁচ দেওয়া আলমারীর মধ্যে একটা মেয়েকে ভরে দিয়ে, অন্য এক যন্ত্র থেকে এই আলমারীর ওপরে আমি একটি অভিনব রশ্মি ফেলতে থাকি। দর্শকের চোখের সামনে মেয়েটির দেহ থেকে ধীরে ধীরে চামড়া, মেদ, মাংস অদৃশ্য হতে হতে অবশেষে পড়ে থাকে শুধু হাড়—নরকঙ্কাল! অবশেষে এই কঙ্কালও বিলীন হয়ে যায়। আলমারীর কাঁচের ডালা খুলে দিতে এক রাশ সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্য থেকে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে—'এই যে, এই যে? আমি এখানে!' এমনি ধারা আরও অনেক খেলা আমি আবিষ্কার করেছি—তাদের কথা তোমাদের কাছে বলব পরে।

এইবারে শুনে রাখো মশলা দুটোর নাম—

(১) আয়োডিন, (২) হাইপো।

প্রথম মশলাটার নাম সবাই জানো। ডাক্তারের কাছেই কিনতে পাবে এ জিনিস। এই মশলা স্পিরিটে গুলে নিয়েই তো তৈরি করা হয় টিংচার আয়োডিন যা নাকি তোমরা লাগাও ক্ষতস্থানে। দ্বিতীয় মশলাটা ফটোগ্রাফারের দোকানে পাওয়া যাবে। এ জিনিস দেখতে মিশ্রীর দানার মতো—কাজেই গুঁড়ো করে নিলে চিনির মতনই মনে হয়। **কিন্তু খুব সাবধান, এ সব মশলা যেন কোনভাবে মুখে না যায়—এ সব কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বিষ।**

আমার পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী হোটেলের বয় সাহেবের জন্য গরম জলে গোলা আয়োডিন একগ্লাস আর চিনির বাটিতে করে কিছুটা হাইপো গুঁড়ো এনে হাজির করেছিল। জলের মধ্যে আয়োডিন গোলা থাকলে তার রঙ ঠিক কফির মতই হয়। আয়োডিনের সঙ্গে হাইপো মিশালে এমন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে, যার ফলে জন্ম নেয় নতুন এক পদার্থ—তার কোনই রঙ নেই। এই খেলাটা স্টেজেও দেখানো যেতে পারে।

এই খেলার সূত্র ব্যবহার করে অন্য একটি খেলা দেখানো যেতে পারে। যাদুকর একটি চকোলেট রঙের রুমাল নিয়ে সেটাকে এক গ্লাস জলে ডুবিয়ে তুলতেই দেখা গেল, রুমালের রঙ চলে গেছে, আর সাদা রুমালের উপরে চকোলেট রঙে বড় বড় করে লেখা রয়েছে GOOD NIGHT। যাদু প্রদর্শনীর শেষ খেলা হিসেবে এ খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক। দর্শকেরা বেশী অবাক হয় এই দেখে যে, যে গ্লাসের জলে রুমালটা ডোবানো হল, তাতে কোন রঙের চিহ্নই পড়ে নেই।

এই খেলার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আগে থেকে। একটা সাদা রুমাল নিয়ে তার ওপরে ভাল চকোলেট রঙ দিয়ে GOOD NIGHT কথাটি লিখে, ভাল করে রঙ শুকিয়ে নেবার পর খুব ঘন আয়োডিন গোলা জলে ছুপিয়ে নিতে হবে। 'টিনচার আয়োডিন'-এও চলবে। শুকিয়ে গেলে দেখা যাবে যে, আয়োডিনের রঙের তলাতে লেখা ঢাকা পড়ে গেছে। খেলা দেখানোর সময় একটা গ্লাসে খানিকটা হাইপো গোলা জল রাখতে হবে। রুমালটাকে এই হাইপো গোলা জলে ডুবিয়ে তুললেই আয়োডিনের দাগ চলে যাবে, আর রঙে লেখা GOOD NIGHT কথাটা ফুটে বেরুবে।

ভূতুড়ে পুতুল

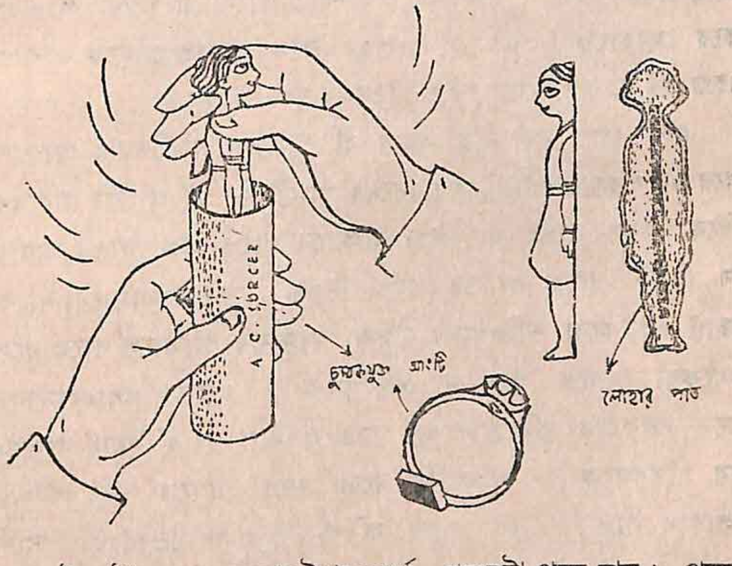
'ভূতুড়ে পুতুল' খেলাটা সত্যিই খুব মজার। খুব বেশী বড় বড় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, এমন কি রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও দেখানো যেতে পারে এই খেলা। চায়ের আসরে বা মজলিসে এ খেলাটা যে চাঞ্চল্যের তুফান তোলে তার তুলনা হয় না। এই খেলার সব চেয়ে মজা এই যে এতে দর্শকেরাও অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পান। এই কারণেই দর্শকচিত্ত জয় করার ক্ষমতা এর অপরিসীম। আমার যাদুকর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি যে, যে খেলায় দর্শকেরা অর্থাৎ দর্শকদের কোনও প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন সেই খেলাই হয় দর্শকচিত্তজয়ী।

কয়েক বছর আগে যখন আমি বিজ্ঞানী হিসেবে বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলাম তখন বিজ্ঞানের খেলা দেখানোর ছলে ছোটদের মজলিসে দু'এক জায়গায় যে এ খেলা দেখাই নি এমনও নয়। এই আজব ব্যাপারটা তখন ছোটদের মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল একথা বলাই বাহুল্য।

খেলাটা সত্যিই খুব মজাদার। যাদুকরের দুই হাতে আছে দু'টো জিনিস—একটা পেস্টবোর্ডের দু'মুখ খোলা 'সিলিণ্ডার' বা চোঙ আর একটা সেলুলয়েডের ছোট হাল্‌কা পুতুল। যাদুকর পুতুলটাকে উঁচু করে তুলে ধরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে থাকেন, 'ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমার হাতে এই যে পুতুলটা আপনারা দেখছেন,

এটা হচ্ছে একটা অসাধারণ পুতুল। এর প্রাণ নাই সত্যি কিন্তু আমি আমার মন্ত্রবলে এতে প্রাণ সঞ্চার করাতে পারি—আর তার পর এই পুতুলকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারি আমার ইচ্ছা মতন কাজ। এক তিব্বতী লামার কাছ থেকে বেশ চড়া দাম দিয়ে কিনে এনেছি এই মন্ত্রসিদ্ধ ভূতুড়ে পুতুল।'

বক্তৃতার শেষে একজন দর্শককে ডেকে এনে তার হাতে চোঙটা আর পুতুলটা তুলে দেন যাদুকর। আর চোঙটাকে খাড়া অবস্থায় ধরে তার মধ্যে পুতুলটাকে রাখতে অনুরোধ করেন। দর্শক



যতবারই চেষ্টা করেন ততবারই হন ব্যর্থ—পুতুলটা পড়ে যায়। পড়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক, চোঙের দু'টো মুখই ফাঁকা যে। চোঙের মধ্যে থাকতে হলে অবলম্বন চাইতো একটা?

দর্শকপ্রবর নানাভাবে চেষ্টা করে বিফলমনোরথ হবার পরে, যাতুকর তাঁর মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন আর তাঁর ভূতুড়ে পুতুলকে রাখেন চোঙের মধ্যে। এবারে কিন্তু পুতুলটা পড়ে যায় না, চোঙের ভেতরেই অনড়ভাবে থাকে।

এর পরে অপর এক দর্শকের হাতে দেওয়া হয় পুতুল আর চোঙ। তিনিও হন অকৃতকার্য প্রথম দর্শকের মতো।

এই ভূতুড়ে পুতুলের মূল রহস্যটা কি জানো?—মন্ত্রতন্ত্র!—মোটেই তা নয়।—এই খেলার সব মন্ত্রতন্ত্র আর সব কিছুর মূল হচ্ছে, ছোট্ট একটা চুম্বক। তোমরা তো সবাই জানো যে 'চুম্বক' আকর্ষণ করে লোহাকে। এই যে চুম্বকের টানে লোহার আট্‌কে থাকার রহস্য এই রহস্যই হচ্ছে ভূতুড়ে পুতুলের মূল কৌশল।

এই খেলা দেখানোর সময়ে বাঁ হাতের আংটিপরার আঙ্গুলে পরে নিতে হয় একটা বিশেষ ধরনের আংটি। এই আংটির বাইরের দিকে যেমন পাথর বা শিল্ড লাগানো থাকে অন্য পিঠে (অর্থাৎ যে দিকটা থাকে হাতের তালুর দিকে) তেমনি লাগানো থাকে ছোট্ট একটুকরো শক্তিশালী চুম্বক আঙ্গুলের আড়ালে থাকে বলে দর্শকেরা দেখতে পান না এই চুম্বক। যাতে অসাবধানতার ফলে দর্শকদের দৃষ্টিতে না ধরা পড়ে সে দিকে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হয় যাতুকরকে। পুতুলটার মধ্যে ভরে রাখতে হয় পাতলা লোহার পাত। এই পাত ফাঁপা পুতুলের ভেতরের অংশে আঠা বা সিমেণ্ট দিয়ে ভালভাবে আট্‌কে রাখতে হয় যাতে ঝাঁকুনি লেগে খট্ খট্ আওয়াজ করে দর্শকদের কাছে এর অবস্থিতির বিষয় জানাতে না পারে। যাতুকর যখন বাঁ হাত দিয়ে

চোঙের মধ্যে পুতুল রাখতে যান তখন চোঙের গায়ে পুতুলটা একটু ঠেকিয়ে দিলেই চুম্বকের টানে পুতুল আটকে থাকে—পড়তেও পারে না। খুব ভাল করে অভ্যাস না করে এ খেলা দেখাতে যেও না কিন্তু। ভালভাবে অভ্যাস করে নিয়ে বন্ধুবান্ধব মহলে দেখিও, দেখবে কেমন অবাক হয়ে যায় তারা এ খেলা দেখে।

ম্যাজিক ট্রাঙ্ক

ম্যাজিক ট্রাঙ্ক খেলাটা পৃথিবীর সব দেশের যাত্নকরের কাছেই পরিচিত। কারণ, এই খেলার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে একজন প্রতিভাসম্পন্ন যাত্নকরের নাম—রবার্ট হুডিন। যাত্নকর হুডিনির নাম বিশ্ব-বিখ্যাত। রবার্ট হুডিন হচ্ছেন হুডিনিরও আগেকার যুগের যাত্নকর। যাত্নকর হুডিনির মনে সাধ হয়েছিল যে রবার্ট হুডিনের মতন নামকরা একজন কৃতী যাত্নকর হবেন। সেই কারণেই নিজের পিতৃদত্ত নামের বদলে হুডিনের নাম নকল করে নিজের নতুন নাম দিলেন 'হুডিনি' অর্থাৎ হুডিনের মতন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস—হুডিনির নামই রইলো বেঁচে। বিশ্ববাসীর মনে হুডিন-এর নাম আজ বিশেষ কেউ জানে না।

ম্যাজিক ট্রাঙ্ক খেলাটার আবিষ্কর্তা হচ্ছেন রবার্ট হুডিন। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যাত্ন-জগতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব আবিষ্কারের কতগুলি চমকপ্রদ খেলা দিয়ে। এই খেলাগুলির মধ্যে অনেকগুলোই ছিল বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক। চুম্বক, বিত্যুৎ ও নানা ধরনের যান্ত্রিক কলাকৌশল দিয়ে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা করতেন রঙ্গমঞ্চের উপরে যা দেখে দর্শকেরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়ে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি হতেন শ্রদ্ধান্বিত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নানাবিধ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে খেলা দেখানো ছিল তাঁর প্রিয় শখ আর এই শখের ফলে বহুক্ষেত্রে তিনি কেমনভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন তার

নানা গল্প শোনা যায়। তার থেকেই একটা গল্প তোমাদের কাছে বলছি এখন।

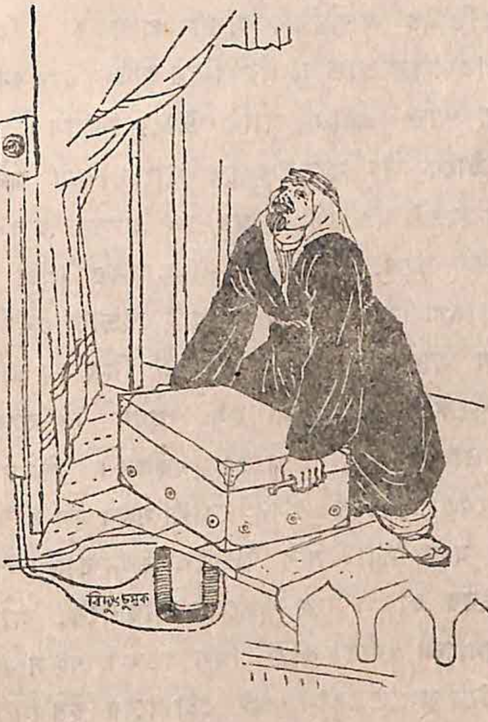
রবার্ট হুডিন তখন তাঁর যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন আফ্রিকার আলজিরিয়া অঞ্চলে। এক গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাসী সরকার তাঁকে আলজিরিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। ফরাসী জাতির অধিকৃত দেশ হচ্ছে এই আলজিরিয়া—বহুদিন থেকেই এ আছে ফরাসী শাসকদের শাসনাধীন। যে সময়ের কথা বলছি তখন আলজিরিয়ায় ছিল এক ধরনের ফকির শ্রেণীর লোক। এরা হাটে-বাজারে-মাঠে-ঘাটে নানা প্রকারের ভেল্কীবাজি দেখিয়ে বেড়াতো আর শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের বিদ্বেষমূলক কথা প্রচার করে বেড়াতো। অশিক্ষিত অধিবাসিবৃন্দ তাদের ঐ সমস্ত ফকিরদের ভেল্কীবাজি দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে তাদের প্রতি। এইভাবে তাদের মনে শাসক শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগে আগে এই সমস্ত অশিক্ষিত আলজিরিয়াবাসী জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে শ্বেতাঙ্গ লোকেরা ঈশ্বরের ন্যায় সর্বশক্তিমান। এই কারণেই সাদা-চামড়াওয়ালা লোকদের তারা দেখতো বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে। তাদের মনে ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধাচরণ করলে ঈশ্বর তাদের মাথায় বজ্র নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু তাদেরই সমগোত্রীয় সাধারণ লোক যখন নানা অলৌকিক কার্যকলাপ দেখাতে লাগলো তখন তারা আস্তে আস্তে বুঝতে আরম্ভ করলো যে অলৌকিক ক্ষমতায় তাদের জাতির কালা-আদমীরাও কম নয়।

ফরাসী শাসকবর্গের কানে এই সব ঘটনার কথা পৌঁছানোর সঙ্গে

সঙ্গে তারা হয়ে উঠলেন সন্ত্রস্ত। উপায় একটা বের করতে হবে যেমন করেই হোক। হঠাৎ তাদের মাথায় এলো এক অভিনব ফন্দী। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ভেল্কীবাজি দেখিয়েই দূর করতে হবে ভেল্কীবাজির প্রভাব। যাদুকরকেই নিযুক্ত করতে হবে যাদুকরের প্রভাব থেকে অশিক্ষিত জনগণকে মুক্ত করার কাজে। দেখিয়ে দিতে হবে যে সাদা-চামড়াওয়ালা লোকেদের অলৌকিক ক্ষমতা তাদের ফকিরদের চেয়ে অনেকগুণে বেশী। সন্ধান চলতে লাগলো একজন কৃতবিদ্য যাদুকরের।

অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসী সরকার আবিষ্কার করলেন ফরাসী যাদুকর রবার্ট হুডিনকে। নানা প্রকারের যাদুসরঞ্জামে সজ্জিত করে তাঁকে পাঠানো হল আলজিরিয়াতে। দিনের পর দিন কেটে যায়। এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে ঘুরে বেড়ান যাদুকর হুডিন শ্বেতাঙ্গদের অলৌকিক ক্ষমতার বিজয়-বৈজয়ন্তী বহন করে। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার কাছে হার মানে ফকিরদের কেরামতি। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ অজ্ঞ দর্শকদের কেউ কেউ লুটিয়ে পড়ে তাঁর পায়ের কাছে। কেউ বা রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ছুটে আসে তাঁর কাছে একটু আশীর্বাদ লাভের জন্য। সবাই তাঁকে মনে করতে থাকে ঈশ্বর-প্রেরিত দেবদূত বলে। ক্রমে দেশী ফকিরেরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে গা-ঢাকা দেয় সাধারণ লোকের বিরূপ ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে। এমনি করেই শাসক শ্রেণীর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা আবার বৃদ্ধি পায়। নিরুপদ্রবে চলতে থাকে শাসনকার্য অব্যাহত গতিতে যাদুকর হুডিনের যাদুমাহাত্ম্যে।

এই সময়ে যাদুকর হুডিনের প্রোগ্রামের বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল ম্যাজিক ট্রাঙ্ক। এই খেলাটার কথা এবার বলছি শোন।



যাদুকর হুডিনের নির্দেশে তাঁর সহকারী রঙ্গমঞ্চের উপরে এনে হাজির করতো একটা বড় সাইজের হালকা স্টীল-ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের তালা খুলে দেখিয়ে দেওয়া হত যে তার ভেতরে কোন কিছু নেই, অতি সাধারণ ট্রাঙ্ক একটি। এর পরে একজন বলিষ্ঠ

দর্শককে ডেকে নিয়ে আসতেন তিনি রঙ্গমঞ্চের উপরে। আর তাকে অনুরোধ করতেন ঐ ট্রাঙ্কটিকে উঁচু করে তুলে সবাইকে দেখাতে। অতি সহজেই দর্শকপ্রবর ট্রাঙ্কটিকে উঁচু করে তুলে সবাইকে দেখিয়ে আবার তা রেখে দিতেন মঞ্চের উপরে। এইবার আরম্ভ হত হুডিনের অলৌকিক শক্তির প্রভাব। দর্শকটির মুখের উপর দিয়ে বার কতক হাত বুলিয়ে নিয়ে হুডিন বলতেন, 'তোমার দেহের সমস্ত শক্তি এবার আমি উঠিয়ে নিলাম। চেষ্টা করে দেখতো ট্রাঙ্কটাকে উঁচু করে তুলতে পারো কিনা মঞ্চ থেকে?' —কথা শেষ হতেই দর্শকটি ট্রাঙ্কের দুই হাতল ধরে দিল টান। কিন্তু নট্ নড়ন্ চড়ন্, নট্ কিচ্ছু—এক চুলও নড়ল না ট্রাঙ্কটা তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে। দর্শক মশাই বহুভাবে চেষ্টা করলেন—দাঁড়িয়ে, বসে আর হাঁটুগেড়ে—কিছুতেই কিছু হল না। আরও একজন দর্শককে ডেকে আনা হল প্রথম দর্শককে সাহায্য করার জন্য, তারপরে এলো আরও একজন। তিনজন জোয়ান লোকের সমবেত চেষ্টাতেও টেনে তোলা সম্ভব হল না বাক্সটাকে। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যখন সবাই সরে দাঁড়ালো তখন হুডিন এগিয়ে এসে বাঁ হাতে ট্রাঙ্কের হাতল ধরে তুললেন ট্রাঙ্কটাকে, আর বললেন, 'যতক্ষণ তোমাদের দেহে শক্তি ছিল ততক্ষণ এই সামান্য ওজনের ট্রাঙ্কটাকে টেনে তুলতে কোন কষ্টই তোমাদের হয় নি কিন্তু আমি যখন তোমাদের দেহ থেকে সমস্ত বল তুলে নিই তখন এই হালকা ট্রাঙ্কটাও তুলতে পার না তোমরা। কাজেই বুঝতে পারছ, কত অসহায় তোমরা। ইচ্ছে করলে আমার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমার যা ইচ্ছে হবে তাই করতে পারি আমি।'

কেমন করে রবার্ট হুডিন এই অসম্ভবকে সম্ভব করে ছিলেন সেই কথাই এখন বলছি শোন। এই খেলাটার কৌশল বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে বিদ্যুৎ চুম্বকের প্রকৃতির বিষয়ে দু'চার কথা। বিদ্যুৎ চুম্বক কাকে বলে এবং তার কর্মপদ্ধতিই বা কি তা তোমাদের আগেই বলেছি 'ভূতুড়ে হাত' খেলা প্রসঙ্গে।

যাদুকর হুডিন তৈরি করেছিলেন একটি খুব শক্তিশালী বিদ্যুৎ চুম্বক। এই বিদ্যুৎ চুম্বকটিকে তিনি লাগিয়ে রেখে ছিলেন রঙ্গমঞ্চের পাটাতনের নিচে আর এর তারে বিদ্যুৎ প্রবাহের চাবিকাঠি বা স্যুইচ্‌টা রেখেছিলেন সাজঘর বা গ্রীনরুমে নিজের সহকারীর হাতের কাছে। বিশেষভাবে ফিট করা এই চুম্বকের উপরেই স্টেজের পাটাতনের উপরে রাখা হত স্টীল ট্রাঙ্কটি। চুম্বকের স্যুইচ বন্ধ-করা অবস্থায় যখন এর তারে কোনও বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতো না তখন যথেচ্ছা নাড়াচাড়া করা যেত এই ট্রাঙ্ক। কারণ এই সময়ে চুম্বক থাকতো মৃত—কোনও আকর্ষণ ক্ষমতাই থাকতো না এতে। কিন্তু যাদুকরের নির্দেশে তার সহকারী চুম্বকের স্যুইচ টিপে তাতে বিদ্যুৎ চলাতেই চুম্বক নিজমূর্তি ধারণ করে অবলীলাক্রমে টেনে ধরতো ট্রাঙ্কটাকে। দু'তিনজন আরব জোয়ান প্রাণপণে চেষ্টা করেও তাই একচুল নাড়াতে পারেনি ট্রাঙ্কটাকে। যাদুকর হুডিন ট্রাঙ্কের সঙ্গে আলগা তারের সংযোগ করে আরও একটি বিশেষ কায়দা করে মাঝে মাঝে অতি উৎসাহী দর্শকদের মৃদুমন্দ বিদ্যুতের শক্ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। একদিন তো এক পালোয়ান ট্রাঙ্ক ধরে টানাটানি করতে করতে এমন এক বেদম শক্ খেলে যে, বাবা রে মা রে—বলে চিৎকার করতে করতে হল ছেড়ে দিলে দৌড়।

ম্যাজিক পেপার

টেবিলের উপরে দুটো কাচের গ্লাসে রয়েছে পরিষ্কার জল আর যাদুকরের হাতে রয়েছে নীল রঙের কাগজের ফালি একটা।

দর্শকদের উদ্দেশ্য করে যাদুকর বললেন, "সমবেত্য ভদ্রমণ্ডলী, আমার হাতে এই যে নীল কাগজের ফালিটি দেখছেন এ কিন্তু খুব সাধারণ কাগজ নয়। মন্ত্রঃপূত কাগজ এটি। এই কারণেই এর সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি আমি। আমার হুকুম তামিল করাই হচ্ছে এই কাগজের কাজ। আমার আদেশে এ রঙ পরিবর্তন করবে।"—এই কথা বলার পরে যাদুকর টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন এক গ্লাস জল আর তার মধ্যে ডুবিয়ে নিলেন কাগজের ফালিটাকে—মুখে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন চং....মং....ফং....। সঙ্গে সঙ্গে নীল কাগজের ফালি হয়ে গেল লাল—বলা বাহুল্য গ্লাসের জলের রঙের কোনই পরিবর্তন ঘটলো না এর ফলে—বর্ণবিহীন জল তেমনই বর্ণ বিহীনই রইলো। এর পরে যাদুকর লাল হয়ে যাওয়া নীল কাগজটাকে হাতে তুলে নিয়ে আবার মন্ত্র পড়লেন চুং....মুং....ফুং....আর হাতে তুলে নিলেন দ্বিতীয় গ্লাসটাকে। দ্বিতীয় গ্লাসের জলে লাল হয়ে যাওয়া নীল কাগজটাকে ডুবিয়ে দিতেই দর্শকেরা দেখে অবাক হলেন যে কাগজটা আবার আগের মতন নীল হয়ে গেছে—লাল রঙের লেশ মাত্র নাই তাতে। বলাবাহুল্য গ্লাসের জলও রয়েছে বর্ণ বিহীন।

দেখে অবাক হয়ে যাবার মতনই খেলা বটে! কাচের গ্লাসে, দুই গ্লাস সাধারণ বর্ণবিহীন জল, কোনও কারসাজি নেই, অন্ততঃ দর্শকেরা দেখে মনে করেন তাই। আর কাগজের ফালিটা তো অতি সাধারণ। দর্শকেরা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেও কোন কৌশল আবিষ্কার করতে পারেন না এতে। তবে কেমন করে সম্ভব হয় এই খেলাটা?

রসায়ন শাস্ত্রে দু'টো কথা আছে, ক্ষারভাব (Alkalinity), আর অম্লভাব (Acidity)। অম্লভাবযুক্ত জিনিস কোন্‌গুলো তা তো জানো বোধ হয় তোমরা। সব রকমের এসিডই অম্লভাবযুক্ত, তার মানে সব শ্রেণীর এসিডেরই স্বাদ হচ্ছে টক। লেবুর রস-ও কি এসিড? হ্যাঁ, লেবুর রসের মধ্যে যে এসিড, তার নাম হচ্ছে সাইট্রিক এসিড। টক দইয়ের মধ্যে আছে যে এসিড তার নাম ল্যাকটিক এসিড। সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতির টকভাব খুব বেশী থাকাতে এরা খুব কড়া। এদের সংস্পর্শে এলে গায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়ে যায়। চুণ, সোডা প্রভৃতি জিনিস হল ক্ষার জাতীয়।

কোন্ জিনিস অম্লভাবযুক্ত আর কোন্ জিনিস ক্ষারভাবযুক্ত সেইটা নিরূপণ করার জন্যই ব্যবহার করা হয় এই নীল রঙের কাগজ। এই নীল রঙের কাগজের নাম হচ্ছে 'ব্লু লিট্‌মাস পেপার'। এর বিশেষ ধর্মই হচ্ছে এই যে কোন অম্লভাবযুক্ত জিনিসের সংস্পর্শে এলে এর নীল রঙের সঙ্গে অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নীল রঙ পরিবর্তিত হয় লাল রঙে। যতক্ষণ পর্যন্ত অম্লভাবযুক্ত জিনিসের অস্তিত্ব থাকে এই নীল কাগজের গায়ে ততক্ষণই এ

থাকে লাল। কোনভাবে এর দেহের ওপর থেকে অম্লভাবটাকে কাটিয়ে দিতে পারলেই এ আবার আগের মতন নীল হয়ে যায়। কিন্তু কেমন করে অম্ল ভাবটাকে নষ্ট করা যাবে?

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ক্ষার জাতীয় জিনিস অম্লভাব নষ্ট করতে পারে। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে অম্লের সংস্পর্শে এসে লাল হয়ে যাওয়া 'ব্লু লিটমাস পেপার'-কে কোন ক্ষারজাতীয় পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেই তার রক্তিমাভা অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসবে স্বাভাবিক নীল রঙ।

যাদুকর দু'টো গ্লাসে যে জল রেখেছিলেন তা সাধারণ জল ছিল না মোটেই। এর প্রথম গ্লাসটাতে ছিল লেবুর রস গোলা জল আর দ্বিতীয় গ্লাসের জলে গোলা ছিল কিছুটা চুণের জল। সাদা চোখে এর কোনটারই অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারেন নি দর্শকবৃন্দ।

যে কোনও ওযুধের দোকানে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে 'ব্লু লিটমাস পেপার'। যদি ডাক্তারখানা থেকে এই কাগজ সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তবে তোমরা নিজেরাও তৈরী করে নিতে পারো এই শ্রেণীর কাগজ অল্প পরিশ্রমে। অতি সাধারণ মোটা সাদা কাগজের ফালি নিয়ে তার দু'পিঠে খুব ভাল করে লাল জবা ফুলের পাপড়ি ঘসে শুকিয়ে নেবে। দেখবে কাগজটা নীল হয়ে গেছে। এই নীল হয়ে যাওয়া কাগজ এবার তোমরা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারবে 'ম্যাজিক পেপার' হিসাবে।

এই 'ম্যাজিক পেপার' খেলাটাকে অন্য ভাবেও দেখানো যেতে পারে 'ভ্রাম্যমাণ কাগজের ফালি' নাম দিয়ে। এ খেলার জন্য ব্যবহৃত হবে লাল আর নীল—এই দুই রঙের দু ফালি কাগজ।

টেবিলের উপরে হু'গ্লাস জল থাকবে পূর্ববৎ। যাহুকর এই গ্লাসের জল দর্শকদের ভালভাবে দেখিয়ে নেবার পর হু'টো খবরের কাগজের ফালি দিয়ে জড়িয়ে ফেল্লেন এই গ্লাস হু'টোকে এমন ভাবে যেন গ্লাসের ভেতরকার জল থাকে দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে অথচ গ্লাসের মুখ থাকে খোলা। এইবার যাহুকর লাল আর নীল কাগজের ফালি হু'টা হাতে নিয়ে দর্শকদের বললেন, "আমার হাতে এই যে হু' রঙের হু'টো কাগজের ফালি দেখছেন এদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে। সর্বসমক্ষে এই যে হু'গ্লাস জল আমি রেখেছি এই টেবিলের উপর, এর একটির মধ্যে আমি রেখে দিচ্ছি এক একটি রঙিন কাগজের ফালি। আমার যাহুপ্রভাবে এরা স্থানপরিবর্তন করবে।"

এই কথা বলে যাহুকর প্রথম গ্লাসে রাখলেন নীল কাগজ আর দ্বিতীয় গ্লাসে রাখলেন লাল কাগজ আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লেন হুং....চং....ফং....। গ্লাসের গায়ে জড়ানো খবরের কাগজের ফালি হুটো খুলতেই দেখা গেল প্রথম গ্লাসে রাখা নীল জল কাগজ চলে গেছে দ্বিতীয় গ্লাসে আর দ্বিতীয় গ্লাসে রাখা লাল কাগজ চলে এসেছে প্রথম গ্লাসে। কাগজের ফালির এই অদ্ভুত স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা দেখে দর্শকেরা বিস্ময়াবিষ্ট হন। এ খেলাটাও যে পূর্বের খেলারই অনুরূপ সে কথা বলাই বাহুল্য। ডাক্তারখানায় কিনতে পাওয়া যায় লাল নীল এই হু'রঙেরই 'লিটমাস পেপার'। নীল 'লিটমাস পেপার' যেমন অম্লজাতীয় জিনিসের প্রভাবে লাল হয়, লাল 'লিটমাস পেপার'ও তেমনি নীল হয় ক্ষারজাতীয় জিনিসের সংস্পর্শে এসে। নীল 'লিটমাস পেপার'কে লেবুর জলে ডুবিয়ে লাল করে নিয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে এ খেলার জন্য।

লেবুর দেহের রক্ত ঝরে

এও কি কখনও সম্ভব ? লেবু কি কোনও রক্তমাংসে গড়া জীব যে তার দেহে থাকবে রক্ত ?—রক্ত থাকলে তবেই তো তা ঝরে পড়তে পারবে। লেবুতে আছে রস কিন্তু তাতে তো কোনও রক্ত নেই। তবে রক্ত আসবে কোথা থেকে লেবুর মধ্যে ? কিন্তু তবুও—

'লেবুর দেহের রক্ত ঝরে,
টপ টপিয়ে মাটির 'পরে !'

যাদুকরের যাদুর গুণেই সম্ভব হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারখানা। ছেলেবেলায় এই খেলাটা খুব দেখাতাম ইস্কুলের সহপাঠী বন্ধুদের মজলিসে। একটা সাজিতে রেখে দিতাম ৫।৬ টা পুরুষ্টু পাতি বা গোঁড়া লেবু। এই সাজিটা বন্ধুদের হাতে দিয়ে বলতাম এর মধ্যে থেকে যে কোন একটি লেবু বেছে বের করার জন্য। তারা তাদের ইচ্ছে মতন পছন্দ করতো একটি লেবু। এই লেবুটাকে হাতে নিয়ে আমি আরম্ভ করতাম আমার বক্তৃতা—"বন্ধুগণ, আমার হাতে এই যে লেবুটা তোমরা দেখছো এটা একটা অতি সাধারণ লেবু। কিন্তু আমার যাদুবলে এই সাধারণ লেবুটাকে দিয়ে আমি দেখাতে পারি এক অসাধারণ যাদুর খেলা।

"প্রাণহীন জড় পদার্থের মধ্যে যে রক্ত থাকে না তা তো জানো তোমরা সবাই। লেবুর প্রাণ নেই, আর লেবু হচ্ছে একই জড় পদার্থ। কাজে কাজেই লেবুর মধ্যে রক্ত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও আমার যাদুপ্রভাবে এই লেবু থেকে গড়িয়ে পড়বে টক্‌টকে

লাল তাজা রক্ত। এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আমি শিখেছি এই আজব যাদুর খেলা—আমার সেই গুরুর নাম স্মরণ করেই এইবার তোমাদের আমি খেলা দেখাবো—

'লেবুর দেহের রক্ত ঝরে
টপ টপিয়ে মাটির 'পরে !'

এই কথা বলে, আমি পকেট থেকে বের করতাম পেন্সিল কাটবার ছুরি একটি। বন্ধুরা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতো এই ছুরিটা—কোনও কৌশল তারা আবিষ্কার করতে পারতো না এই ছুরিটাতে।

এইবার ছুরিটাকে ডান হাতে বাগিয়ে ধরে বাঁ হাতে ধরতাম আমি লেবুটাকে আর আস্তে আস্তে ছুরিটা বসিয়ে দিতাম লেবুর গায়ে। ফলাটা আস্তে আস্তে বসে যেতো লেবুর দেহে। সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়তো টকটকে লাল রক্ত দরদর করে লেবুর গা বেয়ে। লেবুটা যখন কেটে দু'ভাগ করা হত তখন সবাই দেখতো যে লেবুর ভিতরেও বইছে রক্তগঙ্গা।

বলতে পারো, কেমন ক'রে ?

'লেবুর দেহের রক্ত ঝরে
টপ টপিয়ে মাটির 'পরে।'

বলতে পারলে না তো ?—তোমরা হয়তো ভাবছ কোনও মন্ত্র-তন্ত্রের গুণেই হচ্ছে এই অদ্ভুত ব্যাপারখানা। দেখতে খুব চমকপ্রদ হলে কি হবে এর মূল রহস্যটি কিন্তু খুবই সহজ। লেবুতে কোন কৌশলই নেই। বেশী রস আছে এমন ধরনের যে কোনও লেবু দিয়েই করা যেতে পারে এ খেলা। দর্শকদের পছন্দমতন গাছ

থেকে দর্শকদের নির্বাচিত লেবু বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিয়েও এ খেলা বহুবার দেখিয়েছি আমি এবং তাতে খেলা জমেছে আরও বেশী।

যে ছুরি দিয়ে লেবুটাকে কাটা হয় তাতেই থাকে যত কারসাজি। 'ম্যাজিক পেপার' খেলার সূত্রেই হয় এ খেলার কাজ। যাদুর খেলা দেখানোর আগে সকলের অগোচরে ছুরির ফলাতে ঘসে রাখতে হয় লাল জবা ফুলের পাপড়ি। পুরনো ছুরির ময়লা ফলার উপরে জবাফুলের কালচে দাগ মিশে যায়, কারও চোখের ধরা পড়ে না তা। লেবুর রসের অম্লের সঙ্গে জবা ফুলের রসের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে লেবুর রসের রঙ পাল্টে তা নেয় রক্তের রূপ আর—

'লেবুর দেহের রক্ত ঝরে
টপ টপিয়ে মাটির 'পরে।'

কফি আর দুধ

কাচের গ্লাসে রয়েছে আধ গ্লাস কফি আর অন্য একটা কাচের পাত্রে রয়েছে খানিকটা দুধ। এই গ্লাস আর কাচের পাত্র একটা সুদৃশ্য ট্রের উপরে সাজিয়ে নিয়ে যাদুকরের সহকারী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দাঁড়ালো যাদুকরের পাশে। এর পরে যাদুকর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, অনেকগুলি খেলা দেখিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাজেই একটু কফি পান করতে ইচ্ছুক আমি—আপনাদের অনুমতি পেলেই এই কফির সদ্ব্যবহার করতে পারি। আপনাদের কারও আপত্তি নেই আশা করি। আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য আগে থেকেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।"—এই কথা বলে যাদুকর এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকেন। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে একজন গোবেচারা ভদ্রলোককে দেখেই যাদুকর বললেন, "আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমার কফি খাওয়াতে অনেকেরই অমত আছে। ঐ তো দেখুন না কেন, ঐ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে। উনি মুখে কিছু না বললে কি হয়, মনে মনে কিছুতেই আমার কফি খাওয়ার প্রস্তাবটা অনুমোদন করছেন না। এমতাবস্থায় কফি খাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বলে এ কফি আমি ফেলেও দেব না। কারণ, বহু পরিশ্রম করে আমার সহকারী এই কফি তৈরি করে এনেছে। তা হলে কি করা যায়? ব্যস, মতলব পেয়ে গেছি। আমার এই বিশিষ্ট অতিথিকেই আজ আমি আপ্যায়িত করব এই কফি দিয়ে।"

এই কথা বলে যাদুকর হাত দিয়ে দেখালেন পূর্বোক্ত গোবেচারা মতন দর্শক ভদ্রলোকটিকে। আর তাঁকে মঞ্চের উপরে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। ভদ্রলোক কিছুতেই আসতে

চান না। কিন্তু যাদুকর নাছোড়বান্দা। অনেক সাধ্যসাধনার পরে অন্যান্য দর্শকদের পেড়াপেড়িতে ভদ্রলোক তো এসে উঠলেন রঙ্গ মঞ্চের উপরে। কিন্তু সেখানে হলো আর এক মুস্কিল। ভদ্রলোক কিছুতেই কফির গ্লাস হাতে নিতে চান না। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে মিন মিন করে তিনি বললেন যে, কফি তিনি খান না। কিন্তু অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পরে তিনি কফির গ্লাস তুলে নিলেন হাতে। যাদুকর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি 'ব্ল্যাক কফি' বা দুধছাড়া কফি-খাবেন, না দুধ মিশিয়ে? দুধ মেশানো কফি খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় যাদুকর দর্শক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন দুধের পাত্র। নেহাত বিরক্তির সঙ্গেই তিনি উঠিয়ে নিলেন এই দুধের পাত্র। সর্বসমক্ষে দুধের পাত্র থেকে কফির মধ্যে দুধ ঢেলে দিলেন তিনি। এক সঙ্গে হেসে উঠলেন প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক। নিজের হাতে ধরা কফির গ্লাসের দিকে দৃষ্টি পড়তে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। কোথায় কফি আর কোথায় কি!—এক গ্লাস নীল কালী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ভদ্রলোকের অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে আবার হেসে উঠলেন দর্শকমণ্ডলী। মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাতেই যাদুকরকে সাধুবাদে ভূষিত করে করতালিতে মুখর হয়ে উঠল প্রেক্ষাগৃহের চারিদিক। করমর্দনের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় দর্শকটির কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করে যাদুকর তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে আরম্ভ করলেন তাঁর পরবর্তী খেলার কাজ।

এক গ্লাস কফি, তাতে দুধ মেশানোর সঙ্গে সঙ্গেই তা হয়ে যায় কালি—শুনেই তো অবাক হতে হয়, দেখলে পরে যে হতবাক্ হতে

হবে তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে? কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হয় তাইতো ভাবছ এখন? বলে না দেওয়া পর্যন্ত খুবই অদ্ভুত মনে হবে বটে কিন্তু একবার যদি কৌশলটা বলে দেওয়া যায়,—তা'হলে বলে উঠবে, ও এই ব্যাপার! শোন, বলছি এবার এ খেলাটার মূল কৌশল।

বাইরের থেকে দেখে কাচের গ্লাসে রাখা বস্তুটিকে কফি আর কাচের পাত্রে রাখা বস্তুটিকে দুধ মনে হলেও আসলে ও-বস্তু দু'টো কিন্তু মোটেই কফি বা দুধ নয়। কয়েক ফোঁটা টিন্‌চার আয়োডিনের সঙ্গে পরিমাণ মতন জল মিশিয়েই যাদুকর রেখেছিলেন গ্লাসে কফির পরিবর্তে আর দুধের পরিবর্তে কাচের পাত্রে যে পদার্থ তিনি রেখেছিলেন তা সাদা ময়দা-গোলা জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দর্শক ভদ্রলোক যাদুকরের বাক্‌চাতুর্যে ঘাবড়ে গিয়েই কফি বা দুধের সঠিক পরিচয় বুঝতে পারেন নি। তা ছাড়া সামান্য একটু আয়োডিনের গন্ধ যা তাঁর নাকে এসেছিল তা অন্য কোথাও থেকে এসে থাকবে বলে ভেবেছিলেন তিনি।

আয়োডিনের সঙ্গে স্টার্চ জাতীয় কোনও পদার্থের মিলন ঘটলে এমন একটা নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় যার রঙ ঘন নীল। এ হচ্ছে রসায়ন বিজ্ঞানের কথা। ময়দা হচ্ছে স্টার্চ জাতীয় পদার্থের অন্যতম। কাজেই ম্যাজিক কফি (আয়োডিন)-এর সঙ্গে ম্যাজিক দুধ (ময়দা গোলা জল)-এর মিলনের ফলে জন্ম নিয়েছিল কালি। **আয়োডিন গোলা জলের কফি কিন্তু কাউকে খেতে দিও না। এ বিষাক্ত! খুব সাবধান!**

জীবন্ত ছবির ম্যাজিক

প্রাণহীন জড় পদার্থ হচ্ছে ছবি, তার অবার লাজ-লজ্জা কী? কেমন করে লাজুক হবে ছবি? অবাক হচ্ছো তো ব্যাপারটা শুনে? কিন্তু ভাই, অবাক হলে কি হবে, সত্যি সত্যিই কাগজের বুকে আঁকা জড় পদার্থ যে ছবি তাতেও পাওয়া যায় প্রাণের সাড়া যাত্বকরের যাত্বকৌশলের গুণে!

এবার যখন আমি প্যারিসে যাই তখন সেখানকার চিত্রকর সম্প্রদায়ের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম যাত্বর খেলা দেখানোর জন্য। অন্যান্য খেলার সঙ্গে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলাটি আমি চিত্রকরদের জন্যই বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলাম সেইটির কথাই বলছি এখন। আমার প্রোগ্রামের কতকগুলি খেলা দেখানোর পরে আমি দর্শকবৃন্দকে বললাম, "ভদ্রমহোদয়গণ, চিত্র-শিল্পের রথী মহারথী আপনারা এক একজন। ছবিকে কেমন করে স্বাভাবিক করে তোলা যায়—কেমন করে তাকে সত্যিকারের বিষয়বস্তুর মতন প্রাণবন্ত করে তোলা যায় তা আপনারা বেশ ভাল করেই জানেন কিন্তু ছবিতে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন কি আপনারা? পারেন কি ছবির বোধশক্তির কথা প্রমাণ করতে? আমি জানি এ আপনাদের সাধ্যের বাইরে—এই কারণেই আপনাদের মতে এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার যাত্বকাঠির দৌলতে কিন্তু আমার কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। যত কিছু আজগুবি কাণ্ড-কারখানা সবই সম্ভব হয় আমার যাত্বমন্ত্রে। ইচ্ছে করলেই

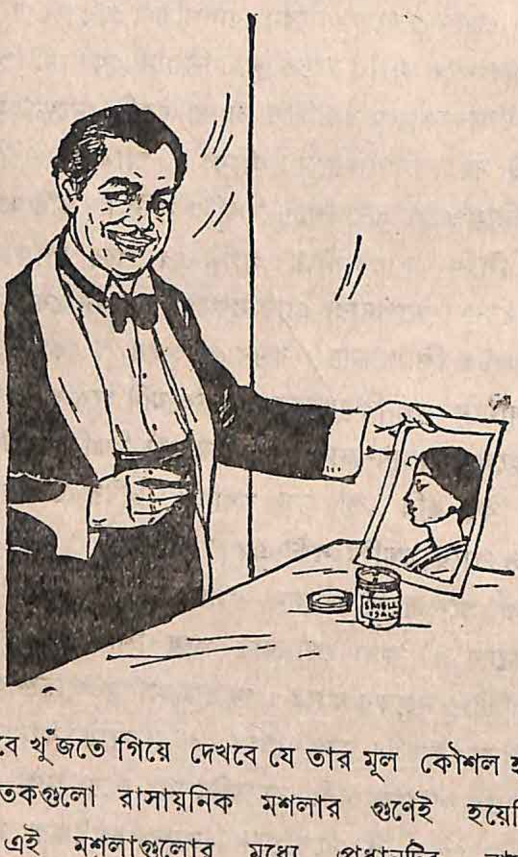
ছবিতে আমি নিয়ে আসতে পারি প্রাণের সাড়া। বোধশক্তি হচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর এক বৈশিষ্ট্য। আমার যাদুকৌশলে প্রাণহীন ছবিতে আপনারা এক্ষুণি দেখতে পারেন বোধশক্তির প্রকাশ।"

এই কথা বলে আমি হাতে তুলে নিলাম একখানা ছবি। সাদা কাগজের উপরে কালো রঙ দিয়ে আঁকা একটি মেয়ের মুখ। চোখ নাক ঠোঁট সবই নিখুঁতভাবে আঁকা। আমার নির্দেশে আমার সহকারী নিয়ে এলো এক শিশি 'স্মেলিং সল্ট'। ছবি আর 'স্মেলিং সল্ট'-এর শিশি হাতে নিয়ে আমি এর পরে দর্শকদের বললাম "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রায় সকলেই জানেন যে নাকের কাছে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরলে কেমন বোধ হয়। কোন সুস্থ লোকের নাকের সামনে অল্প কিছুক্ষণের জন্যেও যদি ধরে রাখা যায় 'স্মেলিং সল্ট' তা হলে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে 'স্মেসিং সল্ট-এর ঝাঁঝের চোটে। কিন্তু ছবি তো জড় পদার্থ। ছবির উপরে কি কোন ক্রিয়া হতে পারে 'স্মেলিং সল্ট'-এর ?"

এ কথা শুনে সবাই বললেন—"না না, কক্ষনো না !"

দর্শকদের এই কথা শোনবার পরে শিশির মুখ খুলে আমি ধরলাম ছবিটার নাকের কাছে। আস্তে আস্তে আরক্ত হয়ে উঠলো ছবিতে আঁকা মেয়েটির মুখ, চোখ, গলা আর কান। শিশিটা সরিয়ে নিতেই আবার ছবির মেয়েটির মুখ হয়ে গেল স্বাভাবিক ! জীবন্ত ছবির এই কীর্তি দেখে তো চিত্রকর দর্শকেরা হয়ে গেলেন বিস্ময়ে হতবাক। কয়েক মিনিট সব কিছু নীরব—যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে সবার। প্রকৃতিস্থ হয়েই সবাই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলেন—আমি করলাম অভিবাদন।

বলতে পারো কেমন করে এই অদ্ভুত খেলাটা আমি দেখিয়েছিলাম? আগেই তো তোমাদের বলেছি যে খেলা যত



চমকপ্রদ হবে খুঁজতে গিয়ে দেখবে যে তার মূল কৌশল হচ্ছে তত সহজ। কতকগুলো রাসায়নিক মশলার গুণেই হয়েছিল এই খেলাটা। এই মশলাগুলোর মধ্যে প্রধানটির নাম হচ্ছে 'ফেনাপথেলিন' [Phenalpthalein]।

ছবিটাকে দেখে অতি সাধারণ বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু ছবিটা মোটেই সাধারণ নয়। এই ছবির মেয়েটির মুখ, চোখ, গলা

কান প্রভৃতি জায়গায় আগে থেকে লাগিয়ে রাখতে হয় একটা রাসায়নিক আরক। খেলা দেখানোর সময়ে ছবিটাকে রাখতে হয় একটু ভিজে ভিজে অবস্থায় অর্থাৎ একেবারে খটখটে শুকনো অবস্থায় নয়। শুকনো অবস্থায় রাখলে কিন্তু খেলাটা হবে না, মনে থাকে যেন!

'স্মেলিং সল্ট' নিতে হয় খুব কড়া দেখে আর একটা মুখ ছড়ানো বড় পাত্রে বা শিশিতে একটু বেশী পরিমাণে, যাতে এর ঝাঁঝটা হয় বেশ জোরালো। কেমন করে এই বিশেষ আরকটি তৈরি করবে সেই কথাটাই বলছি এখন। যে মশলা যে পরিমাণে ব্যবহার করতে বলছি, ঠিক সেই পরিমাণে তা ব্যবহার করবে, ভুল যেন না হয়। **এই মশলাগুলো ব্যবহার করবে খুব সাবধানে। কোনক্রমে মুখে যেন না যায়, এ-গুলো বিষাক্ত কিন্তু—কাজেই খুব সাবধান হয়ে নাড়া-চাড়া করবে এগুলো, বুঝলে?**

আরক তৈরির নিয়ম ঃ

একটা কাচের পাত্রে আধ আউন্স জল আর আধ আউন্স 'মেথিলেটেড স্পিরিট' নাও [এই 'মেথিলেটেড স্পিরিট' নামক জিনিসটি অনেক বাড়ীতেই থাকে স্টোভ ধরানোর জন্য]। আর তার সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নাও প্রায় এক গ্রেন পরিমাণ 'ফেনাপথেলিন' পাউডার। যে কোনও এলোপ্যাথী ডাক্তারখানাতেই কিনতে পাবে এই 'ফেনাপথেলিন' পাউডার। বিশেষভাবে তৈরী এই আরকই এখন লাগাতে হবে ছবিটিতে পরিষ্কার তুলির সাহায্যে।

'স্মেলিং সল্ট' যদি সংগ্রহ করতে না পারো তাহলে নিশাদলের সঙ্গে চুন মিশিয়ে নিয়েও কাজ চালাতে পারো। বেনের দোকানে

পাবে 'নিশাদল' নামক পদার্থটি, আর চুন? সে তো পানের দোকানেই পাওয়া যাবে। একটা বড় মুখওয়ালা শিশিতে চুনের সঙ্গে 'নিশাদল' গুড়ো মেশালেই দেখবে কেমন ঝাঁঝ বেরুচ্ছে ঐ শিশি থেকে।

নিজেদের আঁকা ছবি, খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া ছবি অথবা ফটো—যে কোনও রকমের ছবি দিয়েই এ খেলা দেখাতে পারবে তোমরা—তবে হাঁ, ছবিটা ভেজা ভেজা অবস্থায় থাকা চাই খেলা দেখানোর সময়ে আর আরকটা বহুদিন আগে লাগিয়ে রাখা না-হওয়া চাই। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আরক লাগানোর অল্পক্ষণ পরেই দেখাতে পারো এই খেলা! 'স্মেলিং সল্ট' থেকে বেরোয় 'অ্যামোনিয়া গ্যাস'। এ গ্যাস ক্ষারভাবাপন্ন, কাজেই এর সংস্পর্শে এসে ফেনাপথেলিন লাল হয়ে যায়।

ম্যাজিক সরবৎ

'ম্যাজিক সরবৎ' খেলাটি সত্যই খুব চিত্তাকর্ষক। পেশাদার যাদুকর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে যখন আমি বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত ছিলাম, তখন ছোটদের আসরে প্রায়ই আমি দেখাতাম এই খেলাটা। এই অদ্ভুত খেলাটা দেখে ছোটরা খুবই অবাক হত। কেনই বা অবাক হবে না বলো? সাধারণ বর্ণবিহীন জল যদি দেখতে দেখতে চোখের সামনে লাল টুকটুকে সরবতের মতন হয়ে যায় তবে কি অবাক না হয়ে পারে কেউ? ছোটদের মজলিশে এই খেলাটা এত জমে যে তা আর বলে বোঝানো যাবে না। কিছুদিন আগে লণ্ডনের এক শিশু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্য খেলার সঙ্গে এই আজব খেলাটাও আমি দেখিয়েছিলাম একটা অদ্ভুত গল্প-সহযোগে। রূপকথার গল্প খুব ভালবাসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, তাই রূপকথার এক ছোট্ট গল্প দিয়েই শুরু করেছিলাম আমার খেলা। টেবিলের উপরে রাখা তিনটি গ্লাসের দিকে প্রথমে আমি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালাম। তিনটি কাচের গ্লাস—প্রথম ও দ্বিতীয়টির অর্ধাংশ পূর্ণ আছে সাধারণ জলে। তৃতীয়টি শূন্য। এর পরে শুরু হল আমার গল্প ঃ

এক যে ছিল রাজা—তার হাতিশালে হাতি—ঘোড়াশালে ঘোড়া-পাত্র-মিত্র-সভাসদ—দাসদাসী সৈন্য-সামন্ত—ধন-দৌলত—মণি-মাণিক্য কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু তবুও সে রাজার মনে ছিল না শান্তি। জলদেবীর অভিশাপে তার জীবন

হয়ে উঠেছিল অভিশপ্ত। কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে জলদেবী দিয়েছিলেন এক কঠোর শাস্তি। জলদেবীর অভিশাপে রাজা কোনদিন জল পান করতে পারতেন না—রাজার হাতের ছোঁয়া লাগতেই জল পরিবর্তিত হত সরবতে। তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা জলের পাত্র হাতে তুলে নিতেই তা হয়ে যায় সরবত—কিন্তু জলের স্বাদ কি সরবতে পাওয়া যায়? রাজার মনে নেই শান্তি। পাত্র-মিত্র-সভাসদ, এদের চোখে নেই ঘুম। রাজার অশান্তি দূর করতে হবে। অবশেষে বৃদ্ধ মন্ত্রী আরম্ভ করলেন জলদেবীর আরাধনা। দশ দিন, দশ রাত্রি ধরে সমুদ্রের তীরে বসে উপবাসী মন্ত্রী করেন তপস্যা। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে জলদেবী আবির্ভূতা হলেন, দিতে চাইলেন বর। মন্ত্রী চাইলেন মহারাজের দুঃখমোচনের বর। জলদেবী বললেন, "বৎস, আমার অভিশাপ তো ব্যর্থ হবে না। তবে তোমার পুরস্কার তুমি নিশ্চয়ই পাবে। মহারাজ কখনও পূর্ণ পাত্র জল পাবে না—অর্ধ পাত্র জলে মাত্র রইলো তার অধিকার।"

এর পর থেকে মহারাজ জল পান করতে পারতেন বটে কিন্তু পানপাত্র সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করে তিনি জল পান করতে পারতেন না। পাত্র জলপূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে জল পরিবর্তিত হত সরবতে।

টেবিলের উপরে এই যে গ্লাস দেখছো এ দিয়েই এখন আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো ব্যাপারটা। এখানে তো আর নেই সে রূপকথার রাজা।

মনে করো আমিই সে রাজা। এই যে দেখ এই গ্লাস দুটোর অর্ধাংশ ভরা আছে জলে। দুই গ্লাসের জল একত্র করলেই এবার অভিশাপ অনুসারে তা হয়ে যাওয়া উচিত সরবৎ। দেখা যাক কি

হয়।—এই কথা বলে আমি প্রথম গ্লাসের জল ঢেলে দিলাম দ্বিতীয় গ্লাসে আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেল টুকটুকে লাল, ঠিক সরবতের মতন। এর পরে আমার সহকারী প্রবেশ করলো রঙ্গমঞ্চে আর হাতে তুলে নিল তৃতীয় গ্লাসটি। সহকারীর হাতের এই খালি (?) গ্লাসটিতে আমি ঢেলে দিলাম সরবৎ—সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে গেল বর্ণবিহীন সাধারণ জল! দেখে তো সবার চক্ষু চড়কগাছ!!

বলতে পারো কেমন করে এই খেলাটা দেখানো সম্ভব হয়েছিল? খুব সহজ একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে এই খেলার মূলে। প্রথম আর দ্বিতীয় গ্লাসে যা জল বলে আমি দেখিয়েছিলাম তা কিন্তু আসলে সাধারণ জল ছিল না। প্রথম গ্লাসের জলে গোলা ছিল কিছুটা 'ফেনাপথেলিন' পাউডার। 'জীবন্ত ছবির খেলা' প্রসঙ্গে এই 'ফেনাপথেলিন'-এর কথা বলেছি। দ্বিতীয় গ্লাসের জলের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিলাম একটুখানি ক্ষার জাতীয় পদার্থ ['ম্যাজিক পেপার' প্রসঙ্গে এই ক্ষার জাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি]। তোমরা দ্বিতীয় গ্লাসের জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা কড়া চুনের জল মিশিয়ে নিও। তৃতীয় গ্লাসটা দেখে একেবারে খালি মনে হলেও আসলে তার ভেতরে মাখানো ছিল লেবুর রস বেশ ভাল করে।

'ফেনাপথেলিন' পাউডারের বিশেষ গুণই হচ্ছে এই যে এর সঙ্গে কোনও ক্ষার জাতীয় জিনিস মিশলেই এর রঙ যায় পাল্টিয়ে। ক্ষার জাতীয় জিনিসের সংস্পর্শে এলে এর সাদা রঙ পাল্টে হয়ে যায় লাল। চুন হচ্ছে ক্ষার জাতীয় পদার্থের অন্যতম। এই কারণে চুনের সঙ্গে মিশে এ হয়ে যায় লাল। প্রথম গ্লাসের জলে

গোলা 'ফেনাপথেলিন' যখন দ্বিতীয় গ্লাসের জলে মেশানো চুনের সঙ্গে মেশে তখন দ্বিতীয় গ্লাসে জন্মায় টুকটুকে লাল সরবৎ। অম্ল জাতীয় পদার্থ ক্ষার জাতীয় পদার্থের ক্ষারভাব নষ্ট করে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অম্লগুণও হারিয়ে ফেলে। এই কারণেই ক্ষার জাতীয় পদার্থ আর অম্লজাতীয় পদার্থকে শত্রুভাবাপন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়।

যে সমস্ত লোক অম্লরোগে ভোগেন, পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পান তারা। পাকস্থলীর ভেতরে খুব বেশী পরিমাণে অম্ল রসের সঞ্চার হলেই হয় এই অম্লরোগের উৎপত্তি। এই অম্লনাশের জন্য ব্যবহার করা হয় ক্ষার জাতীয় পদার্থ। 'সোডি বাই-কার্ব' বা সোডা খেতে দেওয়া হয় রোগীকে। এই সোডা পেটের ভেতরে গিয়ে অম্লের সঙ্গে মিশে রোগযন্ত্রণা দূর করে।

বোলতা যখন হুল ফোটায় তখন হুল ফোটানোর সঙ্গে দেহে ঢেলে দেয় এক রকমের অম্লজাতীয় পদার্থ 'ফরমিক এসিড'। এই এসিডের অবস্থিতির ফলেই বোলতার দংশনের পরে দষ্টস্থানে এত জ্বালা অনুভূত হয়। দষ্টস্থানে 'এসিড'-এর বিষক্রিয়া দূর করবার জন্য তাই দেওয়া হয় চুনের প্রলেপ। চুন ক্ষারজাতীয় পদার্থ—কাজেই এর প্রভাবে অম্ল জাতীয় পদার্থ 'ফরমিক এসিড'-এর তীব্রতা হ্রাস পায়।

আগেই বলেছি যে তৃতীয় গ্লাসটাতে থাকে কড়া লেবুর রস। দ্বিতীয় গ্লাসের সরবৎ (ফেনাপথেলিন + চুনের জল) তৃতীয় গ্লাসের সঙ্গে যখন মেশে তখন লেবুর রসের অম্লগুণের ফলে চুনের জলের ক্ষারভাব নষ্ট হয়ে যায়। আগেই বলেছি যে 'ফেনাপথেলিন'

এর সঙ্গে যতক্ষণ ক্ষার জাতীয় পদার্থ মিশে থাকে ততক্ষণই তার রঙ থাকে লাল—স্বাভাবিক অবস্থায় এর রঙ সাদা। এই কারণেই লেবুর রস মিশে সরবৎ হয়ে যায় বর্ণবিহীন জলের মতন। এখন বুঝলে তো কেমন করে ম্যাজিক সরবৎ খেলাটা আমি দেখিয়েছিলাম ?

এই ম্যাজিক সরবৎ পদার্থটি দিয়ে একটি খুব মজাদার ব্যাপার করা যায়। হোলির উৎসবে লোকের গায়ে তো খুব রঙের পিচকারী মারো তোমরা ? এই ম্যাজিক সরবৎ জিনিসটা দিয়ে যদি জামাকাপড়ে পিচকারী মার তাহলে খুনখারাপীর মতন রঙ হবে কাপড়ে। এই রঙ কিন্তু খুব বেশীক্ষণ থাকবে না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই দেখবে যে কাপড়ে রঙের লেশ মাত্র নেই, শুধু একটু ভেজা ভেজা রয়েছে কাপড়। **একটা বিষয়ে খুব সাবধান, এই সরবৎ যেন ভুলক্রমে খেয়ে ফেলো না—স্বাস্থ্যের পক্ষে এ কিন্তু খুব ক্ষতিকর। এ কিন্তু বিষতুল্য।**

ডিমের ভেলকি

রবারের ডিম ?—না, ঠিক রবারের ডিম নয়, তবে এর কার্যকলাপ ঠিক রবারের ডিমের মতন। এই কারণেই একে বলা হচ্ছে রবারের ডিম।

একটা সরু মুখওয়ালা বোতল—আর একটা ডিম নিয়ে যাদুকর আরম্ভ করেন তাঁর খেলা। বোতল আর ডিম (?) দু'টো জিনিসই তিনি ছেড়ে দেন দর্শকদের হাতে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। দর্শকরা পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কোনও কৌশল নেই বোতলে বা ডিমে (?)।

ডিম আর বোতল হাতে নিয়ে যাদুকর আরম্ভ করেন তাঁর বাক্‌চাতুরী, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার হাতে এই যে ডিমটা আপনারা দেখছেন এটা সাধারণ ডিম হলেও আমার মন্ত্র-প্রভাবে এ অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। আপনারা সবাই তো দেখছেন যে আমার হাতের এ বোতলটির মুখ অত্যন্ত সংকীর্ণ। এর ভেতর দিয়ে যে কোনমতেই ডিমটা ঢুকে যেতে পারে না সে বিষয়ে তো আপনারা সবাই নিঃসন্দেহ। সাধারণভাবে এই বোতলের ভেতরে ডিম ঢুকতে পারে না। কোনমতেই এ সম্ভব নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানেন, যাদুকরের যাদুমন্ত্রের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।" —এই কথা বলে যাদুকর তাঁর হাতের ডিমটাকে খাড়াভাবে বোতলের মুখের উপরে ধরে আস্তে আস্তে চাপ দিতে থাকেন ডিমটাতে। ডিমটাকে সঙ্কুচিত হয়ে আস্তে আস্তে বোতলের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখে সবাই অবাক

হন। অবশেষে যখন আস্ত ডিমটাকে বোতলের মধ্যে বিরাজমান দেখা যায় তখন তো হাততালিতে মুখর হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ।

এর পরে বোতলের মধ্যে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে যাদুকর দর্শকদের মধ্যে নেমে আসেন বোতল হাতে—সকলেই হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, না, সত্যি সত্যিই ডিমটা বোতলের মধ্যে প্রবেশ করেছে!

খেলাটার কৌশল এবার তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এ খেলাটাকে ঠিকভাবে দেখাতে হলে বেশ ভাল ভাবে যাদুর খেলার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হবে। ইংরেজীতে একে বলে 'চেঞ্জিং'। চেঞ্জ করা মানে যে পালটানো, তাতো জানো তোমরা সবাই। ম্যাজিকের এই 'চেঞ্জিং'-ও ওই পালটানোর কাজেরই নামান্তর। তবে হাঁ, এই পালটানোর ব্যাপারটাকে করতে হয় এমন নিপুণতার সঙ্গে যে দর্শকেরা যেন কোন মতেই এই ব্যাপারটা বুঝতে না পারেন।

যে ডিমটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য দর্শকদের হাতে দেওয়া হয়েছিল আর যে ডিমটা বোতলে ঢোকানো হয়েছিল এই দুটো ডিম কিন্তু এক নয়। দর্শকদের হাত থেকে ডিম ও বোতল ফেরৎ নিয়ে যাদুকর যখন তাঁর বক্তৃতা করছিলেন সেই সময়েই কোনও ফাঁকে তিনি দর্শকদের পরীক্ষিত ডিমটাকে সরিয়ে ফেলে হাতে তুলে নিয়েছিলে এক কৌশল করা ডিম।

একটা টাটকা হাঁস বা মুরগীর ডিম নিয়ে সেটিকে ডুবিয়ে রাখতে হয় কড়া 'ভিনিগার'-এ ২৪ ঘন্টা। [ভিনিগার জিনিসটা সংগ্রহ করা খুবই সহজ। যে কোন বড় স্টেশনারী দোকানেই

পাবে।] ২৪ ঘণ্টা পরে ভিনিগার থেকে উঠিয়ে নিলে দেখবে ডিমের খোলাটা নরম হয়ে রবারের মতন হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা পরেও যদি নরম না হয় তবে পাত্রে নতুন করে ভিনিগার ঢেলে দিয়ে আবার ডোবাবে ডিম। ভিনিগারে ডুবিয়ে নরম করে নেওয়া ডিমই হচ্ছে যাদুকরের কৌশল করা ডিম। এই কৌশল করা ডিম বোতলের মুখের উপরে খাড়াভাবে রেখে আস্তে আস্তে চাপ দিলে সহজেই তা ঢুকে যাবে বোতলের ভেতরে।

ইংক ইলিউশন

'ইংক ইলিউশন' খেলাটিও কম চমকপ্রদ নয়। যথোচিত বাক্য-বিন্যাস ও আড়ম্বরের সঙ্গে যদি এই খেলা প্রদর্শন করা যায় তবে প্রতিটি দর্শকই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাবেন এ খেলা দেখে। এর প্রমাণ আমি অনেকবার পেয়েছি বহু ক্ষেত্রে। সেবার লণ্ডনের এক মজলিশে আমার এক ইংরেজ যাত্নকর-বন্ধু সবাইকে অবাক করলেন এই মজাদার ম্যাজিকটি দেখিয়ে। এই মজলিশে এর আগে বহুবার আমি গিয়েছি কিন্তু আগেকার যাওয়ার সঙ্গে সেদিনকার আমার যাওয়ার পার্থক্য ছিল অনেক। অন্যান্য বার সেখানে গিয়েছি প্রদর্শক হিসাবে। কিন্তু সেদিন আমি সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম বিশেষ অতিথি হিসাবে। সেদিন আর আমি প্রদর্শক ছিলাম না—সেদিন সেখানে আমি ছিলাম একজন দর্শক মাত্র। সে দিন আয়োজন করা হয়েছিল একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের। ট্যাপ ডান্সিং, যন্ত্র-সঙ্গীত, কণ্ঠ-সঙ্গীত, হাস্যকৌতুক ও পরিশেষে ম্যাজিক—এই ছিল সেদিনের অনুষ্ঠান। সবগুলো অনুষ্ঠান একের পর এক হয়ে যাবার পরে শেষে এলো ম্যাজিকের পালা। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো—আবহ-সঙ্গীত বেজে উঠলো মৃত্থ লয়ে। যবনিকার অন্তরাল থেকে ঘোষক বা M. C. যাত্নকরের পরিচয় দিলেন মাইকের মাধ্যমে। পর্দা খুলে গেল। সহাস্য মুখে যাত্নকর অভিবাদন জানালেন। ত্ব'দিক থেকে ত্ব'জন সহকারিণী ছুটে এসে যাত্নকরের হাত থেকে টুপি ও তাঁর পোশাকের

বহিরাবরণ 'কেইপ' নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর প্রথম খেলাতে একটি খালি বাক্স থেকে নানা রকমের জিনিস বের করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। এর পরে তিনি দেখালেন তাঁর বিখ্যাত 'ইংক ইলিউশন'। একটি বড় কালির দোয়াত নিয়ে তিনি দেখালেন দর্শকদের। সবাই দেখলেন যে ঐ দোয়াতের মধ্যে সর্ব-সমক্ষে যাহুকর একটি বোতল থেকে খানিকটা কালি ঢাললেন। দোয়াতে কালি ঢালার পরে যাহুকরের এক সহকারিণী বোতলটি নিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন। এইবার যাহুকর আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা ঃ

"লেডিস এণ্ড জেণ্টলমেন, এবার আপনাদের কাছে যে খেলাটি আমি দেখাবো সেটি আমার খুব বিখ্যাত খেলা। এ খেলার নাম আমি দিয়েছি 'ইংক ইলিউশন'। এইমাত্র বোতল থেকে যে কালি আমি এই দোয়াতে ঢাললাম সেই কালি দিয়েই আমি দেখাবো আমার এই 'ইংক ইলিউশন'। এইমাত্র যে কালি এই দোয়াতে আমি ঢাললাম তার রঙটা কী ? লাল, বেগুনী, সবুজ, কালো, না নীল ? বলতে পারছেন না তো কেউ ? জানি, আপনারা কেউই বলতে পারবেন না। এর কারণও জানি আমি। আপনারা শুধু এইই দেখেছেন যে এই দোয়াতে কালি ঢালছি আমি। কোন্ রঙের কালি যে ঢাল্‌ছি তাতো আর দেখাই নি আপনাদের, এ আমারই ভুল। আচ্ছা, এবার এ ভুল সংশোধন করে নেয়া যাক।"—এই কথা বলে যাহুকর টেবিলের ওপর থেকে এক ফালি সাদা কাগজ তুলে নিয়ে সেটাকে মুড়ে রোল করে নিলেন আর একজন দর্শককে উঠে আসতে

বললেন স্টেজের উপরে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন মোটাসোটা টাকওয়ালা ভদ্রলোক উঠে এলেন স্টেজের উপরে। যাদুকর আগন্তুকের সঙ্গে করমর্দন করে জানতে চাইলেন তাঁর নাম। ভদ্রলোক তাঁর নাম বললেন—মিঃ জে. অ্যাডাম্‌স। এর পরে যাদুকর মিঃ অ্যাডাম্‌সের হাতে কাগজের রোলটি তুলে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন দোয়াতে কালির মধ্যে সেটিকে ডুবিয়ে নেবার জন্যে। যাদুকরের নির্দেশ মতন আগন্তুক কাগজের রোলটিকে দোয়াতের কালিতে ডুবিয়ে তুললেন। সবাই দেখতে পেলেন যে সাদা কাগজের রোলের একটি প্রান্তে ব্লু-ব্ল্যাক কালির ছোপ লেগেছে। এতে করে সবাই বুঝতে পারলেন যে যাদুকর ঐ দোয়াতে ব্লু-ব্ল্যাক কালি ঢেলে রেখেছেন। এইবার যাদুকর আবার আরম্ভ করলেন তাঁর বাক্‌চাতুর্য!—"লেডিস এণ্ড জেণ্টলমেন, এইমাত্র আপনারা জানতে পারলেন যে দোয়াতে ব্লু-ব্ল্যাক কালি আছে। আপনাদেরই একজন প্রতিনিধি এসে আপনাদের তরফ থেকে তদন্ত করে এই রায় দিলেন যে দোয়াতে ব্লু-ব্ল্যাক কালি আছে। কেমন মিঃ অ্যাডাম্‌স, তাই নয়?"

মিঃ অ্যাডাম্‌স্ জবাব দেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়।"

এর পরে যাদুকর তার সহকারিণীকে ডেকে আর একবার কালির বোতলটিকে নিয়ে আসতে বললেন। সহকারিণী বোতল নিয়ে এসে দোয়াতের মধ্যে কিছুটা কালি ঢেলে দিলে এতে করে কাগজের রোল ডোবানোতে যে ঘাটতি হয়েছিল তা পূরণ হলো। সহকারিণী বোতল নিয়ে চলে যেতে যাদুকর বলতে আরম্ভ করলেন, "আপনারা তো জানেনই যে যাদুকরের কাজই হ'চ্ছে অসম্ভবকে

সম্ভব করা। আমি আমার যাদু-প্রভাবে এই কালির কালিমাকে উড়িয়ে দিতে পারি।

বক্তৃতা শেষে যাদুকর তাঁর যাদুর কাঠি হাতে নিয়ে দুবার দোয়াতের চার পাশে ঘুরিয়ে নিলেন আর মিঃ অ্যাডাম্‌সের হাত থেকে কাগজের রোলটি নিয়ে রোলের যে প্রান্তে কালির ছোপ লাগানো তার উল্টো দিকের সাদা প্রান্ত ডুবিয়ে দিলেন কালিভর্তি দোয়াতের মধ্যে। দোয়াত থেকে যখন তিনি রোলটিকে তুলে নিলেন তখন সবাই অবাক হয়ে দেখলেন যে তাতে কালির দাগতো দূরের কথা, সামান্য একটু ছোপও লাগে নি কালির! এর পরে সঙ্গে সঙ্গেই যাদুকর দোয়াতটি উল্টে দিলেন এক সিট সাদা কাগজের ওপরে। কালির ছোপ লেগে চিত্র বিচিত্র হয়ে গেল সেই সাদা কাগজ। এ দেখে তো দর্শকেরা আরও অবাক। কেমন করে সম্ভব হল এই অভাবনীয় ব্যাপারখানা? ভেবে কোনও সমাধানের সূত্র পেলেন না দর্শকেরা। আমার পক্ষে কিন্তু আজব খেলার মূল কৌশল খুঁজে পাওয়া মোটেই কষ্টকর হয় নি। অনুষ্ঠানের শেষে পিকাডেলি সার্কাসের এক রেস্টুর‍্যাণ্টে বসে চা খেতে খেতে যখন আমার ঐ যাদুকর বন্ধুটি আমাকে জোর গলায় বললেন, "আজ পর্যন্ত কোন দর্শকতো দূরের কথা, কোনও যাদুকরই আমার 'ইংক ইলিউশন' খেলাটির মূল কৌশলের কথা বুঝতে পারেন নি। তবে তুমি যদি আমাকে তোমার 'আলট্রা প্রেডিকশন' খেলাটির কৌশল বলে দাও তবে এ খেলাটি তোমাকে আমি শিখিয়ে দিতে পারি।" উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, "সব কথাই তো শুনলাম বন্ধু,

তোমার ইংক ইলিউশনের কৌশল কি এখনও অজানা আছে আমার কাছে?"

—"তুমি বুঝতে পেরেছ?"

—"তোমার খেলাটিকে তুমি যতই কঠিন মনে করো না কেন বন্ধু, আমার আলট্রা প্রেডিকশনের কাছে এ কিছুই নয়। তোমার নির্দেশে তোমার সহকারিণী যখন দোয়াতে কালি ঢাললো তখনই আমি বুঝলাম যে ও কালি নয়, অন্য কিছু—খুব সম্ভবতঃ কোনও রাসায়নিক মশলা। এমন কোনও মশলা যার প্রভাবে কালি তার স্বাভাবিক বর্ণ বা ধর্ম হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু শেষকালে যখন তুমি সাদা কাগজের উপরে কালির দোয়াত উল্টে দিয়ে দেখালে যে কালি তার বর্ণ হারায় নি তখন আমি একটু ভাবনায় পড়েছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাকে দিল এই মহা সমস্যার সমাধান। এখন আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে সহকারিণী বোতল থেকে ঢেলেছিলো রজনের (Resin) গুঁড়ো। —ঠিক নয় কি?" আমার এ জবাব শুনে তো বন্ধুবরের মুখে আর কথা সরে না। তার এত কঠিন খেলাটির কৌশল ধরে ফেললাম আমি কেমন করে?

* * *

যাদুকরের কাছে ছিল একই রকমের দু'টো কালির খালি বোতল। দু'টো বোতলের গায়েই এক রকমের বড় বড় দুটো কালির লেবেল। বোতল দুটোর একটার মধ্যে ছিল ব্লুব্ল্যাক

কাগজ পোড়ে না আগুনে

আগুনে কাগজ পোড়ে না !—একি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? বিশ্বাস না করলে আর কী করা যাবে বলো ! সত্যি সত্যি এমনি ঘটনাও ঘটানো যায় যাদুবিদ্যার দৌলতে।

সেবার ইংলণ্ড সফর কালে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম কেম্ব্রিজ শহরে। এই কেম্ব্রিজ শহরেরই একটি ছোট পার্টিতে কয়েকজন ছাত্র-বন্ধুর সামনে এই অদ্ভুত খেলাটি প্রথম দেখাই। আমি একটুকরো খবরের কাগজ পকেট থেকে বের করলাম সবার সামনে। দর্শকেরা সবাই হাতে নিয়ে দেখলেন যে অতি সাধারণ কাগজ—কোনও কারসাজি নেই।

এইবার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "বন্ধুগণ, এই কাগজটাকে আগুনে পোড়ালে যে ছাই হবে সেই ছাই দিয়ে একটা মজার ম্যাজিক দেখাতে চাই আমি। আপনাদের মধ্যে কেউ কি উঠে এসে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন ?"

আমার কথা শুনে একজন আইরিশ ভদ্রলোক উঠে এলেন রঙ্গমঞ্চের উপরে।

তাঁর হাতে আমি তুলে দিলাম এই কাগজের টুকরো আর অনুরোধ জানালাম দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে এই কাগজে অগ্নি সংযোগ করার জন্য। পকেট থেকে দেশলাই বের করে ভদ্রলোক একটি একটি ক'রে কাঠি জ্বালিয়ে এই কাগজের টুকরোটাকে

কালি আর অন্যটির মধ্যে ছিল বেশ ভালভাবে গুঁড়ো করা রজন (Resin) কিছুটা। প্রথমবার খালি দোয়াতে সে ১নং বোতল থেকে ঢেলে নিয়েছিল কালি। দ্বিতীয়বারে তাঁর সহকারিণী ২নং বোতল এনে দোয়াতের কালির বদলে রজনের গুঁড়ো ঢেলে দেয়। রজনের গুঁড়ো কালির উপরে একটি স্তরের সৃষ্টি করে থাকায় কাগজের রোলটি দোয়াত ডুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলে ওতে কোনও কালির ছোপ পড়ে না।

জ্বালাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ক্রমেই সফল হলেন না তিনি। পর পর সবগুলো কাঠিই শেষ হয়ে গেল। কাঠি জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেল কিন্তু কাগজে আগুন ধরলো না মোটেই।

তাঁকে বিফল দেখে অন্য আর এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। বহুভাবে চেষ্টা করলেন তিনিও। বলা বাহুল্য তিনিও সফল হলেন না। তাঁরও দেশলাই-এর বাক্স নিঃশেষ হয়ে গেল অবিলম্বে।

কাণ্ডকারখানা দেখে তো সবাই অবাক। তাইতো, এ কেমন করে সম্ভব? বৈশ্বানরের সর্বগ্রাসী জিহ্বা কেমন করে ব্যর্থ হল?

তোমরাও তো ভাবছ ঐ একই কথা?

শোন তবে খেলাটার গোপন কথা। যত কিছু কারসাজি তা আছে ঐ কাগজের টুক্‌রোটার মধ্যেই। খেলা দেখানোর আগে ঐ কাগজের টুক্‌রোটাকে আমি ডুবিয়ে নিয়েছিলাম এক বিশেষ আরকে। এই আরকটা তৈরী করে নিতে হয় দু'টো রাসায়নিক মশলা পরিমাণ মতন ভাগে জলের সঙ্গে গুলে নিয়ে। এই আরক তৈরী করার জন্য একটু মাপজোখের দরকার আছে।

প্রথমে শুনে নাও রাসায়নিক মশলা দু'টোর নাম।

(১) বোরিক এসিড গুঁড়ো।

(২) সোডিয়াম ফসফেট গুঁড়ো।

এই মশলা দু'টো কিনতে পাবে ডাক্তারখানায়। এ বিষাক্ত জিনিস, কাজেই খুব সাবধানে ব্যবহার করবে। কোনও ভাবে এ যেন মুখে না যায়।

একটা কাঁচের পাত্রে পাঁচ আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার জল নিয়ে তার সঙ্গে ভাল ভাবে মেশাবে ১২০ গ্রেন বোরিক এসিড গুঁড়ো আর ১৪৪ গ্রেন সোডিয়াম ফসফেট গুঁড়ো। জলের সঙ্গে এ দু'টো জিনিস বেশ ভাল ভাবে মিশে গেলে তৈরী হল আজব আরক। এই আরকের মধ্যে একখণ্ড ভাল কাগজ ডুবিয়ে তুলে যদি শুকিয়ে নাও তবেই তৈরী হবে সেই আজব কাগজ, যে কাগজ পোড়ে না আগুনে।

ঠিক পরিমাণ মতন জল আর মশলা দুটো না নিলে কিন্তু চলবে না। কাগজ ছাড়া, রুমাল দিয়েও এ খেলা দেখানো যেতে পারে। তৈরী করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খেলা না দেখালে কিন্তু কাগজের বা রুমালের গুণ চলে যাবে।

ডুবুরী ডিম

একটা লম্বা ধরনের কাঁচের জার (Jar), প্রায় সবটুকুনই তার ভর্তি আছে জলে। একটা ডিম নিয়ে এসে দিলাম আমি তোমাদের হাতে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে তোমরা ডিমটা। না, কোনও কারসাজি নেই এতে—খুবই সাধারণ ডিম একটি—হাঁসের বা মুর্গীর।

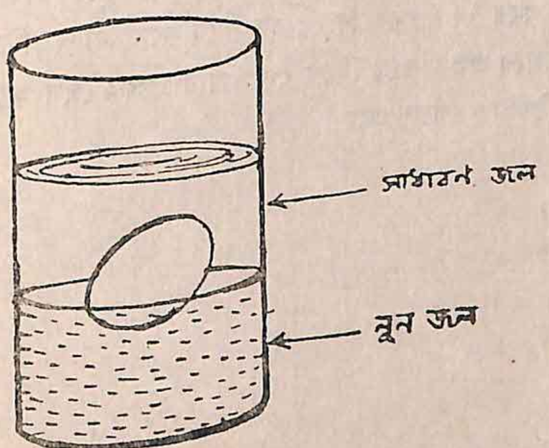
তোমাদের হাত থেকে ডিমটাকে নিয়ে আমি ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম, হিং-চিং-চিং-ফিং-ক্রিং-ক্রিং-রিং-হিং' আর আস্তে আস্তে ঐ ডিম ছেড়ে দিলাম জারের জলের মধ্যে। আস্তে আস্তে জলের তলায় ডুবে যেতে থাকলো তা। হঠাৎ আমি বললাম—'স্টপ !' মাঝপথে থেমে গেল ঐ ডিম—আর ডুবছেও না, ভেসেও উঠছে না—ত্রিশংকুর মতন অবস্থা। এ দেখে তো তোমরা সবাই হলে অবাক। তাইতো, জড় পদার্থ ডিম সে কেমন করে হল আমার আজ্ঞাবহ !! এখানেই কিন্তু বিস্ময়ের শেষ নয়—এর পরে এলো নূতনতর বিস্ময়। আমার সহকারী আমার হাতে তুলে দিল একটি কাঁচের রড্। তোমাদের দেখিয়ে আমি বললাম, 'এই কাঁচের রডটি হচ্ছে আমার যাহুর কাঠি। এর সাহায্যে আমি করতে পারি অনেক আজগুবী কাণ্ডকারখানা।"

অতঃপর এই কাঁচের রড্টিকে জারের জলে ডুবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে দিতে ম্যাজিকের মন্ত্র পড়তে থাকলাম—

"হ্রিম-ট্রিম রিম,
ডোবরে ওরে ডিম"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রের গুণ প্রকাশ পেলো। আপনা থেকেই জলের তলায় ডুবে যেতে থাকলো ঐ ডিম। এবার তোমাদের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল--হাততালিতে মুখর হয়ে উঠলো চার দিক।

বলতে পারো কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্ভব হল ?—মন্ত্রের গুণে ? হাঁ, মন্ত্রই বটে, তবে এ যাদুমন্ত্র নয়, এ হচ্ছে বিজ্ঞানের মহামন্ত্র। এই খেলাটির মূলে রয়েছে একটি মহামূল্যবান বৈজ্ঞানিক সত্য। 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' কথাটা বোধ হয় শুনেছ তোমরা সকলেই। এই আপেক্ষিক গুরুত্ব সংক্রান্ত তথ্যের উপরেই নির্ভর করছে এই খেলাটির কৌশল। আমি প্রথমে জারটির অর্ধাংশ ভর্তি করেছিলাম



সাধারণ পরিষ্কার জলে। পরে অন্য পাত্রে জলের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণ লবণ গুলে লবণের সরবৎ বানিয়ে নিয়ে একটি ,লম্বা

নলওয়ালা 'ফানেল' (Funnel)-এর সাহায্যে এই 'লবণের সরবৎ' চালান করেছিলাম জারের জলের নিচে আর সঙ্গে সঙ্গে এনে হাজির করেছিলাম তোমাদের সামনে। জারের উপরের দিকে ছিল সাধারণ জল আর 'গুরুত্ব' কম থাকাতে ডিম এর মধ্যে বেশ ভালভাবেই ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু গোল বাধলো তখনই যখন ডিম এসে পৌঁছুলো লবণের সরবতের কাছে। জলের মধ্যে লবণ মিশে থাকাতে এই জলের 'গুরুত্ব' গিয়েছিল বেড়ে। কাজেই এর মধ্যে ডিম ডুবতে না পেরে ভেসে ছিল। ('ডেডসী নামে এক সমুদ্র আছে। সেখানে জলে লবণ বেশী পরিমাণে থাকার ফলে কোনও কিছুই ডোবে না তাতে। তোমাদের মধ্যে যারা সাঁতার জানো না তারাও স্বচ্ছন্দে জলকেলি করতে পারবে ঐ জলে, ডুবে যাবার কোনও ভয় না করে)। পরে কাঁচের রড দিয়ে জলে নাড়া দিতে লবণের সরবৎ আর জল একত্রে মিশে গেল আর গুরুত্ব গেল অনেক কমে। ফলে ডিমটাও গেলো ডুবে।

ভৌতিক ধোঁয়া

স্মগ (Smog) কাকে বলে জানো ?—জানো না ?—বেশ, তবে শোন আমিই বলে দিচ্ছি। ফগ (Fog) কথাটা তো জানা আছে প্রায় সকলেরই। ফগ মানে হচ্ছে সেই জিনিস যাকে আমরা সোজা বাঙ্গলা কথায় কুয়াসা বলি। স্মগ পদার্থটি এই কুয়াসারই সমগোত্রীয়।

ইয়োরোপের নানা দেশে—বিশেষ করে ইংলণ্ডে এই স্মগের দেখা পাওয়া যায় শীতকালে। চিমনি দিয়ে ঘরের ভেতরকার অগ্নিকুণ্ড থেকে যে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে শীতকালে কখনও কখনও সেই ধোঁয়া ভারী হয়ে নীচে এসে ঘরবাড়ী, পথঘাট—সব ঢেকে ফেলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে বহু লোকের জীবনান্ত ঘটে এর ফলে। এই ভারী হয়ে নীচে নেমে আসা ধোঁয়াকেই স্মগ নাম দেওয়া হয়েছে। এই স্মগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ইংলণ্ডে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে আজকাল শীতের মরশুমে।

যাক সে কথা। এখন আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। সেবার শীতকালে যখন আমি ইংলণ্ড সফরে যাই তখন শীত ছিল পুরোদস্তুর। কুয়াসার দৌরাত্ম্য খুব থাকলেও কিন্তু স্মগের সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে, সে আমার সৌভাগ্যই বলো আর দুর্ভাগ্যই বলো। সেই সময়ে লণ্ডনের এক কিশোর মজলিশে আমার আমন্ত্রণ এসেছিলো যাদুর খেলা দেখানোর জন্য। ঐ অনুষ্ঠানে এই 'স্মগ' আর 'ফগ' নিয়ে একটি খুব মজাদার ম্যাজিক

খেলাটার কৌশল কিন্তু খুবই সোজা। দু'টো রাসায়নিক মশলার গুণেই এ খেলা সম্ভব হয়।

(১) লাইকার এমোনিয়া

(২) হাইড্রোক্লোরিক এসিড

পরিষ্কার দু'টো কাঁচের গ্লাস নিয়ে তার একটিতে দু'ফোঁটা লাইকার এমোনিয়া ঢেলে নিয়ে গ্লাসটাকে এমন ভাবে আস্তে



আস্তে ঘোরাবে যাতে গ্লাসের গায়ে (ভেতরের দিকে) ঐ ওষুধ ভাল ভাবে লেগে যায়।

অন্য গেলাসটিতে দু'ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিয়ে প্রথম গেলাসটিতে যেমন করে লাইকার এমোনিয়া লাগানো হয়েছে তেমনি করে লাগিয়ে নেবে।

আমি পরিবেশন করেছিলাম আর বাহবাও পেয়েছিলাম খুব। সেই খেলাটির মূল কৌশলই এখন আমি তোমাদের কাছে বলছি।

কয়েকটি মজাদার খেলা দেখানোর পরে আমি কিশোর দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম দু'টো টেবিলের উপরে রাখা দু'টো কাঁচের গ্লাসের প্রতি। দু'টো গ্লাসই ফাঁকা—ভেতরে কিছুই নেই।

এরপরে দর্শকদের বললাম, "আমার ছোট বন্ধুরা, তোমরা তো স্মগের ভয়ে অস্থির। ফগও কম জ্বালাতন করে না তোমাদের। ভোরবেলায় যখন ইস্কুলে যাবার জন্য পথে বেরিয়ে আসো তোমরা, তখন ফগের দৌরাত্ম্যে তো পথ চলাই মুস্কিল হয়ে পড়ে, তাই না? এইখানে দেখো আমার যাদু প্রভাবে আমি কেমন করে স্মগ আর ফগকে শায়েস্তা করি এই কাঁচের গ্লাসের জেলখানার মধ্যে।"

এই কথা বলে এক টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের গ্লাস তুলে এনে আমি আর এক টেবিলের উপরে রাখা কাঁচের গ্লাসের উপরে উপুড় করে বসিয়ে দিয়ে একটি বড় রুমাল দিয়ে দু'টো গ্লাসকে ঢেকে দিলাম আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়তে থাকলাম—

"হং চং ফং বং লং............

অল্পক্ষণ পরে রুমালটা সরিয়ে নিতেই সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। গ্লাস দুটো ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে। গ্লাস দু'টো আলাদা করতেই তা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরুতে থাকলো। ব্যাপারখানা দেখে তো সবাই অবাক।

এসিড কিন্তু ব্যবহার করবে খুব সাবধানে। কোন প্রকারে এ যেন তোমার হাতের সংস্পর্শে না আসে। গায়ে লাগলে গা পুড়ে যাবে কিন্তু। দু'টো মশলার কোনটাই যেন মুখে না যায়, কারণ এগুলো বিষাক্ত খুব।

বাইরে থেকে দেখে দর্শকেরা বুঝতে পারে না যে, গেলাসে কোনও মশলা মাখানো আছে। স্বচ্ছ কাঁচের গেলাসের উপরে মাখানো এ ওষুধ কারও নজরে পড়ে না। এই মশলা দু'টো থেকে বেরোয় দু'রকমের গ্যাস। এই গ্যাস এমনিতে দেখা যায় না কিন্তু দু'টো গ্যাসের মিলন হলেই তা হয়ে যায় ভারী আর সাদা ধোঁয়াটে রকম। আর তা চোখে ধরা পড়ে। এই জন্যেই খেলা আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত দু'টো গেলাসকে রাখতে হয় একটু দূরত্বে।

বাকী অংশ তো খুবই সহজ। গ্লাসের উপরে গ্লাস উপুড় করে দেওয়া আর রুমাল চাপা দেওয়া। এ তো একটু অভ্যাস করলেই তোমরা আয়ত্ত করে নিতে পারবে।

রুপোলী 'হাঁসের ডিম'

সে এক আজব দেশ। সূর্যিমামা যেখান থেকে ওঠে আর যেখানে অস্ত যায়—সেই উদয় অস্ত সাগরের ওপারে আছে সেই আজব দেশ। আজব দেশ, যেখানে নীলকান্ত মণিতে গড়া ময়ূর তার চুণী-মুক্তায় গড়া পেখম মেলে চরে বেড়ায় চন্দনের বনে—রুপোর গাছে ফলে সেথা লাখো লাখো মুক্তা ফল—দুধ সায়রের সাদা জলে দলে দলে ভেসে বেড়ায় শ্বেত পাথরের হাঁসের দল—সোনার ফুলে উড়ে বসে হীরের প্রজাপতি—

সে দেশের হদিস জানো ?—জানো না তো ? সেই দেশে আছে এক সোনার হাঁস।—রাজকুমারীর খুবই আদরের। কেন জানো ? রোজ সকালে সে হাঁস দেয় একটা করে রুপোর ডিম। সোনার হাঁসের রুপোর ডিম। কী মজা বল তো ! দেখতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে, তাই না ? কিন্তু কী করা যাবে বল ভাই, সে দেশে তো কোনও জ্যান্ত মানুষ যেতে পাবে না। রাক্ষস-খোক্কস-দত্যি-দানা সব ওৎ পেতে বসে থাকে সেখানে যাবার পথের আশে-পাশে—জনমানবের সাড়া পেলেই হয়, অমনি লেগে যায় তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, কে আগে ধরবে কে আগে খাবে।

একবার হয়েছিল এক মজার কাণ্ড। সোনালী হাঁস পথ হারিয়ে উড়তে উড়তে এসে পড়েছিল লোকালয়ে। শীতের রাত। হিমালয়ের পাদদেশে একটি গ্রাম। সেখানেই একটি ছোট্ট ছেলে সোনার হাঁসকে দিয়েছিল আশ্রয়—খেতে দিয়েছিল দুধ-ভাত, পান

করার জন্য দিয়েছিল জল এক কাঁচের বাটীতে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই ছেলেটি ছুটে গেল সেখানে হাঁসকে রেখেছিল যেখানে। কিন্তু হাঁস তো নেই সেখানে! অনেক খোজাখুঁজি করেও সোনার হাঁসকে আর পাওয়া গেল না। জল খাবার জন্য যে কাঁচের বাটী রাখা ছিল তার মধ্যে দেখা গেল একটি 'রুপোলী ডিম'। পাশেই একটা কচি কলা পাতার ওপরে হিজিবিজি অক্ষরে লেখা ছিল—

"খোকন তোমায় দিলাম উপহার
দেখেই শুধু আনন্দ পেও....
ছুঁয়ো না—খবরদার।"

—খোকনের বাবা একদিন অভাবে পড়ে আমার কাছে ভাগ্যিস ঐ ডিম আর বাটী বেচে দিয়েছিল। তাই না তোমাদের দেখাতে পারছি আজ ঐ আজব হাঁসের, আজব ডিম! এই কথা বলে আমি কাঁচের বাটীতে রাখা ঐ ডিম নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখালাম আমার কিশোর দর্শকদের। তার পরে তাদেরই দু'জনকে স্টেজের উপরে ডেকে উঠিয়ে এনে বললাম, হাঁসের আদেশ অমান্য করে দেখো তো কি হয়। ডিমটা তুলে আনো তো ভাই!" ডিম তুলে আনতে দেখা গেল এক আজব ব্যাপার। কোথায় রুপোর ডিম?—এ যে কালো কালি মাখা .অতি সাধারণ ডিম। এর রুপোলী বর্ণচ্ছটা কোথায় হয়ে গেছে উধাও। ডিমটাকে আবার জলে ডোবাতেই কিন্তু তার উজ্জ্বল রং আবার ফিরে এলো।—কেমন করে এ সম্ভব হল? তোমরা কি এটাকে সত্যি সত্যিই রূপকথার রাজ্যের ডিম বলে বিশ্বাস করছ? না, তা নয় কিন্তু। এ বৈজ্ঞানিক ভেলকি।

খুব বেশী পরিমাণ ধোঁয়া বেরোয় এমন একটি দীপশিখা (কেরাসিনের লম্ফ)-তে একটি ডিম সাবধানে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে তার চারিদিকে লেগে যাবে কালো কালি। এইভাবে কালি মেখে নেওয়া ডিম জলে ডোবালে বাইরে থেকে তা রুপোলী দেখাবে। কেন বলছি শোন ঃ

প্রদীপ শিখার থেকে বেরিয়ে আসা সূক্ষ সূক্ষ কালির কণার আস্তরণ জলে ভিজতে পারে না অধিকন্তু হাওয়ার এক হালকা আস্তরণ একে জলের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখে। হাওয়ার এই অদৃশ্য আস্তরণ থেকে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয় জলের তলায়। আর ঐ রশ্মি আমাদের চোখে পড়ে, যেমন ধরো আয়না থেকে আলোর রশ্মি ঠিকৃরে আসে তেমনি। জলে আয়নার মতন ঠিক চক্ চক্ করে ডিম।

হংকং-এর ম্যাজিক

পূর্ব এশিয়ার হংকং শহর। চারদিকে নীল জল, মাঝখানে পাহাড়ের গায়ে সাজানো গোছানো বড় বড় বাড়ী। সত্যিই অতি মনোরম এই ছোট্ট শহরটি। ঝক্‌ঝকে্ তক্‌তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেবার এই হংকং শহরের এক কিশোর মজলিশে আমন্ত্রিত হয়ে আমাকে দেখাতে হয় কতকগুলি মজাদার ম্যাজিকের খেলা। এখন আমি যে খেলাটির কথা তোমাদের কাছে বলতে যাচ্ছি সেটিও সেই মজলিশেই আমি প্রথম দেখাই আর দেখিয়ে বাহবাও পাই প্রচুর।

ওখানকার চীনদেশের লোকেরা ঠিক আমাদেরই মতন মন্ত্রতন্ত্রে খুব বিশ্বাসী। কোনও চীনে পরিবারে বেড়াতে গেলেই দেখবে তাদের বাড়ীর দেওয়ালে লাল রঙের কাগজে বা কাপড়ে লেখা নানা রকমের মন্ত্র ঝুলছে। গৃহকে অপদেবতা বা অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই এই সব ব্যবস্থা। দর্শকদের প্রায় সবাই চীনদেশীয়, কাজেই মন্ত্রতন্ত্র ঘটিত এই খেলাটি দেখানোর ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। 'সঞ্জীবনী মন্ত্র'ই আমি ব্যবহার করেছিলাম আলোচ্য খেলাটিতে।

একটি কাঁচের ডিশে আছে সামান্য একটু জল আর তার মাঝখানে দাঁড় করানো আছে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। আমার হাতে আছে একটি সাধারণ টেবিল ল্যাম্পের চিমনী। দর্শকদের দিয়ে সব কিছু পরীক্ষা করিয়ে নেবার পরে আমি এই চিমনীটি দিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে দিলাম ঢেকে। দেখতে দেখতে

দর্শকদের চোখের সামনে মোমবাতির শিখা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে হয়ে অবশেষে গেল মিলিয়ে। মোমবাতি গেল নিভে। নিভে যাবারই তো কথা। মোমবাতি জ্বলার ফলে যে গ্যাসের উৎপত্তি হয় তা জমতে থাকে চিমনীর তলার দিকে, অক্সিজেন যায় ফুরিয়ে, মোমবাতিও তাই যায় নিভে। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

এইভাবে মোমবাতি নিভে যাবার পরে আমি একজন দর্শককে ডেকে এনে তাকে বললাম চিমনীটা তুলে নিতে। সে আমার আদেশ পালন করলো। আমার নির্দেশে সে আবার মোমবাতিটাতে আগুন লাগালো, আবার ঢাকা দিল চিমনী দিয়ে। মোমবাতির শিখা ক্ষীয়মাণ হতে আরম্ভ করতেই আমি হাতে তুলে নিলাম একটি লাল রঙের কাগজের ফালি, ইঞ্চি তিনেক লম্বা। এই কাগজ বা কার্ড-বোর্ডের ফালির উপরে লেখা ছিল কতকগুলি মন্ত্র আজব ভাষায়। এইটিকে হাতে নিয়ে আমি দর্শকদের বললাম, "এই কাগজে লেখা আছে 'সঞ্জীবনী মন্ত্র,' মৃতকল্প দীপশিখাকে এ দেবে নূতন প্রাণ"। একটি তারের টুকরোর সঙ্গে এবার এই কাগজটাকে লাগিয়ে আমি চিমনীর ভেতরে দিলাম ঝুলিয়ে! দেখতে দেখতে শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল—প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। দেখে তো সবাই অবাক।

এবার শোন কেমন করে সম্ভব হল এই অসম্ভব ব্যাপারটা। আসলে মন্ত্রতন্ত্র সবই ভূয়ো। হিজিবিজি কেটে রেখেছিলাম ঐ কাগজে। চিমনীর উপর দিককার কার্ডবোর্ড বা শক্ত কাগজের ফালি দিয়ে সেটির একপ্রান্ত মুড়ে একখণ্ড তারের সঙ্গে বেঁধে এমন

ভাবে ঝুলিয়ে দেবে যেন দু ইঞ্চি পরিমাণ তা ঝুলে থাকে। এইভাবে চিমনীর উপরের দিকটা দু'ইভাগে বিভক্ত হওয়ায় এর একভাগ দিয়ে ভাল হাওয়া প্রবেশ করে আর অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় মোম-জ্বলা গ্যাস। পরীক্ষা করে দেখোতো তোমরা দেখাতে পার কিনা এই মজার খেলাটি। করে দেখে ফলাফল আমাকে জানাবে।

একটি চমকদার ম্যাজিক

মোমবাতি জ্বলছে—জ্বলছে তো জ্বলছেই—নিষ্কম্প শিখা। এক ফালি কাগজ নিয়ে ভাঁজ ক'রে তাই দিয়ে তৈরী করলাম একটি ডোঙ্গা। বাঁ হাতে এই ডোঙ্গাটাকে ধরে ডান হাতে নিলাম একটি কাচের গ্লাস। ডোঙ্গাটার এক-প্রান্ত রইলো শিখার ওপরে আর অন্য প্রান্তে কাৎ করলাম গ্লাসটাকে। মুখে বললাম, ম্যাজিকের মন্ত্র—

ইকির মিকির ঝিকির
আমার যাদুর ফিকির
গ্লাসে আছে ভূতবিতাড়ন মন্ত্র
মুখে আছে যাদুর মহান মন্ত্র
লাগ লাগ লাগ লাগ
যাক্ দূরে সব যাক্
এবার চিকিং ফাক্
লাগবে সবার তাক্
শিখার জীবন সারা
গ্লাসের মাঝে লুকানো ভূত
দিচ্ছে মাথা চাড়া
শিখার জীবন সারা
ছেলে মেয়ে বন্ধুরা মোর
দেখবি এখন দাঁড়া।

মন্ত্র বলে গ্লাসটা কাগজের ডোঙ্গার প্রান্তে কাৎ করতেই মোমবাতির শিখা গেল নিভে। গ্লাস আর কাগজের ডোঙ্গা দুটো

জিনিসই কিন্তু দর্শকদের দেখিয়ে নেওয়া হয়েছে আগে-ভাগেই। তবুও কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা হতে পারে?

কাগজের ডোঙাটাতে সত্যিই কোনও কৌশল বা কারসাজি নেই। যা কিছু কলাকৌশল তা হচ্ছে গ্লাসের ভেতরে। সাদা চোখে অবশ্যি এই গ্লাসের ভেতরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব দেখা যায় না কিন্তু আসলে এ পূর্ণ থাকে 'কারবন ডাই-অক্সাইড' (Carbon di-oxide) গ্যাসে। এই গ্যাসের মজা হচ্ছে এই যে জলের মতন একে যে কোনও পাত্র থেকে ঢালা যায়।

একটা সাইজের পরিষ্কার কাচের গ্লাস নিয়ে তাতে চা চামচের আধ চামচ সোডি-বাইকার্ব (Bicarbonate of soda) নাও, আর তাতে কিছুটা কড়া ভিনিগার (Vinegar) মেশাও। দেখতে না পেলেও জানবে যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ গ্লাস পূর্ণ হয়ে যাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে। এর গন্ধও নেই আর চোখেও একে দেখা যায় না। এর পরে অন্য একটি কাচের গ্লাসের উপরে যদি গ্লাসটাকে কাৎ করে ধর তবে এর ভেতরকার গ্যাসে ভর্তি হবে সেই গ্লাস। এই দ্বিতীয় গ্লাস নিয়ে আসবে দর্শকদের সামনে। অদৃশ্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতির কথা দর্শকেরা বুঝতে পারবে না।

একটা কথা নিশ্চয়ই জান তোমরা যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের গ্যাসের সংস্পর্শে এলেই আগুনের শিখা নিভে যায়। ভালভাবে অভ্যাস করে যদি এ খেলা দেখাতে পার তবে তোমাদের দর্শকেরা অবাক না হয়ে পারবে না। সোডি-বাইকার্ব আর ভিনিগার দুটো জিনিসই পাবে ডাক্তারখানায়।

সাবাস এ. সি. সরকার !

সুনির্মল বসু

সাবাস এ. সি. সরকার ভাই—
করলে বাজিমাৎ,
তুর্কী-নাচন নাচিয়ে সবায়
করলে কুপোকাৎ।
গলায় বাজাও, গীটার-শানাই—
হরেক যাদু তোমার জানাই।
অসম্ভবের ভেলকি তোমার
দেখালে নির্ঘাৎ।
দেশ-বিদেশের গুণীর সভার,
'চক্ষুচড়ক' করলে সবার—
ইয়োরোপের তামাম জনে
ধরালে মৌতাত্,
বিস্ময়েতে বিশ্ব মাতাও
কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ !